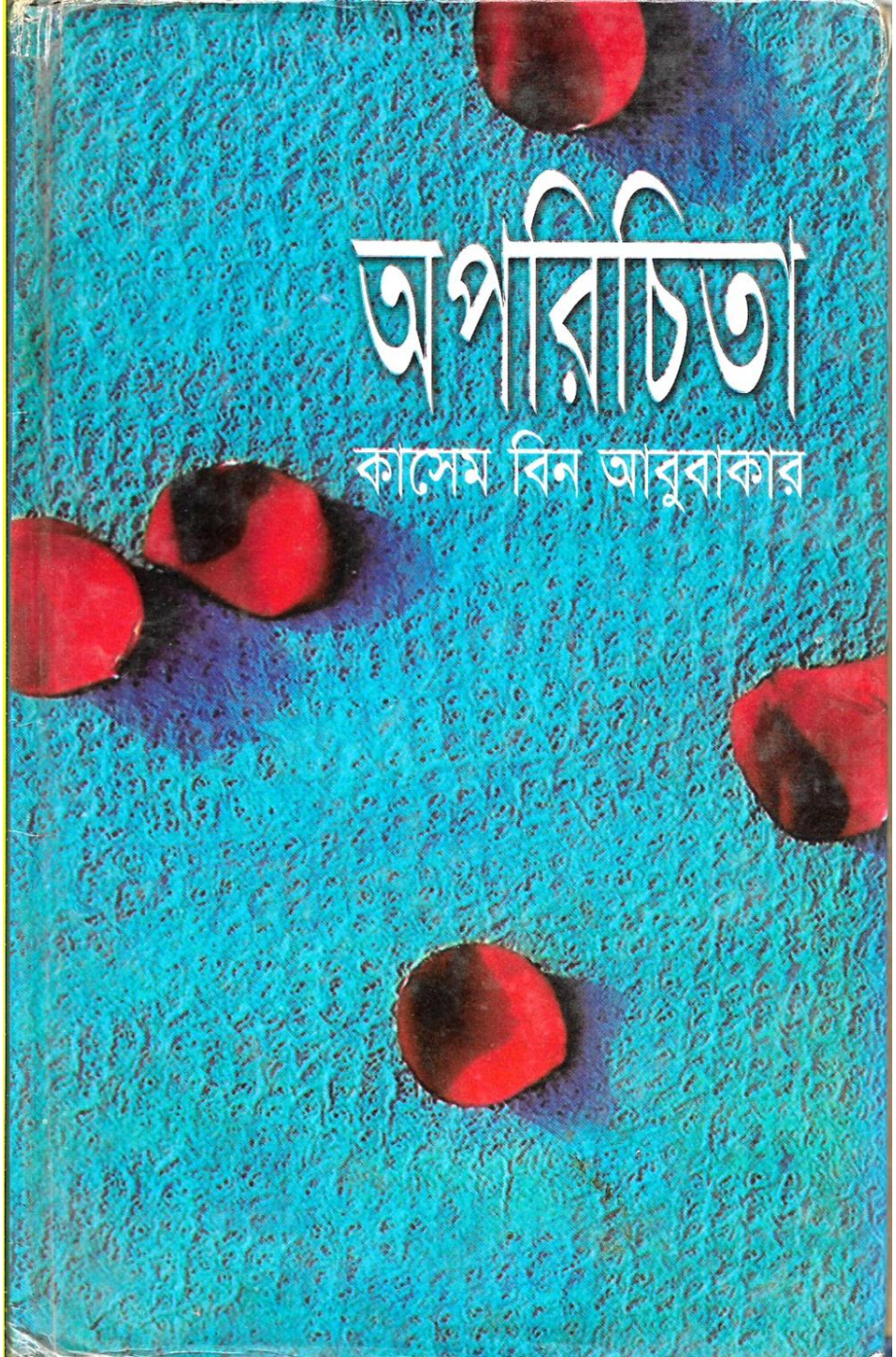
অপরিচিতা
কাসেম বিন আবুবাকার

পিছনের কারটা হর্ণ বাজিয়ে সাইড চাচ্ছে বুঝতে পেরে তানভীর সাইড দিয়ে গাড়ির আয়নায় তাকাল। কারটা পাশ থেকে যখন যাচ্ছিল তখন দেখতে পেল, একটা বোরখাপরা মেয়ে ড্রাইভ করছে। মুখে নেকাব ও চোখে রঙিন চশমা। পাশে দশ বার বছরের একটা সুন্দর ছেলে। অবাক হয়ে ভাবল, ঢাকায় উচ্চ ফ্যামিলীর শিক্ষিত দু'চারজন মডার্ণ মেয়েকে নিজেদের গাড়ি চালাতে দেখলেও কোনো বোরখাপরা মেয়েকে দেখেনি। মেয়েটিকে খুব স্পীডে গাড়ি চালাতে দেখে মনে মনে বলল, আল্লাহ না করুক, এ্যাকসিডেন্ট না করে বসে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পলাশবাড়ি ছেড়ে গোবিন্দগঞ্জের কাছে এসে দূর থেকে দেখতে পেল, ঐ গাড়িটা রাস্তার পাশে দাড়িয়ে আছে আর মেয়েটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ঢাকাগামী গাড়িগুলোকে থামাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু কোনো গাড়িই থামছে না। মেয়েটির গাড়ি খারাপ হয়েছে ভেবে তানভীর নিজের গাড়ির স্পীড কমালো। কাছাকাছি এলে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে তাকেও থামতে বলল।

তানভীর কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। গাড়ি থামিয়ে ব্যাক গীয়ারে পিছিয়ে এলে মেয়েটি বলল, প্লীজ, হেল্প মী।

তানভীর গাড়ি সাইড করে বেরিয়ে এসে বলল, বলুন, কি সাহায্য করতে হবে।

পিছনের একটা চাকা পাংচার হয়ে গেছে। দয়া করে যদি চেঞ্জ করে দিতেন, বড়ই উপকৃত হতাম।

তানভীর লক্ষ্য করল, এখন মেয়েটির মুখে নেকাব থাকলেও চোখে রঙিন চশমা নেই। শুধু চোখ দুটো দেখে মুগ্ধ হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ভাবল, এত সুন্দর চোখ জীবনে দেখে নি।

মেয়েটি অধৈর্য গলায় বলল, কিছু বলছেন না কেন?

তানভীর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, ব্যানেটে নিশ্চয় এক্সট্রা চাকা আছে, চাবি দিন।

মেয়েটি চাবি দিতে তানভীর অনুতিদূরে একটা বড় খিরিশ গাছ দেখিয়ে বলল, আপনারা ঐ গাছের ছায়ায় গিয়ে বসুন।

মেয়েটি সঙ্গের কিশোর ছেলেটিকে ও চায়ের ফ্লাক্স নিয়ে খিরিশ গাছের ছায়ায় বসল।

তানভীর চাকা চেঞ্জ করে তাদের কাছে এসে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, যাবেন কোথায়?

আগে বসুন, চা খান তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।তারপর ফ্লাক্সের মুখে চা ঢেলে দেয়ার সময় বলল, বাড়ি ঢাকা।

আপনাকে আমি মিঠাপুকুর ছেড়ে আসার পর সাইড দিয়েছি, আসছেন কোথায় থেকে?

রংপুর থেকে।

রংপুরে আপনার বাড়ি?

না, ঢাকায়। রংপুরে খালার বাড়িতে এসেছিলাম।

ড্রাইভার কোথায়?

নেই।

নেই মানে?

নেই মানে নেই।

তা হলে নিজেই ড্রাইভ করে এসেছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার মা-বাবার কথা ভেবে অবাক হচ্ছি, ওনারা আপনাকে ড্রাইভার ছাড়া আসতে দিলেন কি করে?

বাবা নেই, দু'বছর আগে মারা গেছেন। মা আপত্তি করেছিলেন, শুনিনি।

সরি, কথাটা বলে আপনাকে দুঃখ দিলাম।

দুঃখ দেয়ার কি আছে; সবাইকেই তো একদিন মরতে হবে।

তানভীর ছোট্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, আপনি খুব খাঁটি কথা বলেছেন। তবুও বলব, এত লং ড্রাইভ করা আপনার উচিত হয় নি।

কেন? মেয়ে বলে? জানেন না, মেয়েরা এখন ছেলেদের মতো সব কাজ করতে পারে?

ততক্ষণে তানভীরের চা খাওয়া হয়ে গেছে। ফ্লাক্সের মুখটা ফেরৎ দেয়ার সময় মৃদু হেসে বলল, ঠিক আছে, এবার চলুন।

মেয়েটি সঙ্গের ছেলেটিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল, হাসলেন কেন?

হাসি পেল তাই হাসলাম।

শুধু শুধু কেউ হাসেও না, কাঁদেও না। দু'টোরই পেছনে কারণ থাকে।

তা থাকে, তবে কারণটা না শোনাই ভালো।

ভালো হোক আর মন্দ হোক, সেটা আমার ব্যাপার, আপনি কারণটা বলুন।

আপনি বললেন, এখন মেয়েরা পুরুষদের মতো সব কাজ করতে পারে, কিন্তু আপনি গাড়ির চাকা চেঞ্জ করার মতো সামান্য কাজটাও করতে পারেন নি।

কথাটার উত্তর দিতে না পেরে মেয়েটি চুপ করে রইল।

ততক্ষণে গাড়ির কাছে এসে তানভীর জিজ্ঞেস করল, ছেলেটা আপনার কে?

খালাত ভাই।

এবার রওয়ানা দিন বলে তানভীর নিজের গাড়ির দিকে যেতে উদ্যত হলে মেয়েটি বলল, আমি এতটা অকৃতজ্ঞ নই যে, পরিচয় না নিয়ে যেতে দেব।

সেটার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

আছে বলেই তো জানতে চাচ্ছি।

আমার বাড়ি বগুড়া। ঢাকায় এক সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার। সাহেবের বাড়ি দিনাজপুর। গতকাল ওনার মাকে নিয়ে এসেছিলাম, আজ ফিরছি।

মেয়েটি বলল, আমার নাম অঞ্জু। তারপর গাড়ির ভিতর থেকে একটা ডাইরী ও কলম নিয়ে তার হাতে দিয়ে বলল, বায়োডাটা লিখুন।

তানভীর মেয়েটার চোখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

অঞ্জু তানভীরের চোখে মুগ্ধতা দেখে মৃদু হেসে বলল, কি হল, বায়োডাটা লিখতে বললাম না?

তানভীর বায়োডাটা লিখে ডাইরীটা ফেরৎ দিল।

হাতের লেখা দেখে অঞ্জু খুব অবাক হল। এত সুন্দর লেখা জীবনে দেখে নি। তারপর বায়োডাটা পড়ে আরো অবাক হয়ে বলল, আপনি এইট পাশ হলেও আপনার হাতের লেখা দারুন। তা আরো লেখাপড়া করলেন না কেন?

ওসব কথা থাক। অনেক সময় নষ্ট হল, এবার রওয়ানা দিন।

অঞ্জু ডাইরীর একটা পাতা ছিঁড়ে ঠিকানা লিখে তার হাতে দেয়ার সময় বলল, যে কোনো দিন সকাল আটটার আগে অথবা বিকেল পাঁচটার পর এই ঠিকানায় আসবেন। ফোন নাম্বার দিয়েছি, আসার আগে ফোন করবেন।

তানভীর কাগজটা পকেটে রেখে চলে যেতে উদ্যত হলে অঞ্জু আবার বলল, আসবেন কিনা বললেন না যে?

সে দেখা যাবে, আপনি রওয়ানা দিন তো।

অঞ্জুর খালাত ভাইয়ের নাম রাশেদ। তাকে গাড়িতে উঠতে বলে তানভীরকে উদ্দেশ্য করে বলল, আসবেন কিন্তু। তারপর গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

তানভীর বগুড়া পর্যন্ত অঞ্জুর গাড়ির পিছন পিছন এলেও মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ধুবচাচিয়া গেল।

বগুড়া পর্যন্ত অঞ্জু গাড়ির সাইড মিররে তানভীরের গাড়িকে পিছনে আসতে দেখেছে। টাউন পার হয়ে দেখতে না পেয়ে ভাবল, হয়তো বাড়ি হয়ে ফিরবে।

অঞ্জুর বাবা এহতেশাম উদ্দিন একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। অঞ্জু মা বাবার একমাত্র সন্তান। ক্লাস নাইনে উঠে অঞ্জু সাইন্স বিভাগে পড়তে চাইলে এহতেশাম উদ্দিন বললেন, আমাদের কোনো ছেলে নেই। থাকলে সাইন্স বিভাগে পড়তে নিষেধ করতাম না। আমার ইচ্ছা তোকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের উপর শিক্ষিত করার। প্রয়োজনে তোকে ফরেনে পাঠাব ঐসাবজেক্টের উপর উচ্চশিক্ষা নেয়ার জন্য।

সেখানে অঞ্জুর মা লুবাবা বেগম ছিলেন। স্বামীর কথা শুনে বললেন, তোমার ইচ্ছা থাকলে তো হবে না। মেয়ের ইচ্ছা থাকতে হবে। ও বিজ্ঞান বিভাগে যখন পড়তে চাচ্ছে তখন ওর ইচ্ছাটাকেই তো আমাদের মেনে নেয়া উচিত।

হ্যাঁ, তা উচিত। তবু কেন ওকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের উপর উচ্চশিক্ষিত করার কথা কললাম শুনবে? বয়স বেশি হয়ে গেলে আমি যখন ব্যবসা চালাবার অযোগ্য হয়ে যাব অথবা হঠাৎ যদি মারা যাই তখন ও যেন আমার ব্যবসার হাল ধরতে পারে।

লুবাবা বেগম মেয়েকে বললেন, তুই এখন যা, কোন বিভাগে পড়বি, পরে আমি তোকে জানাব। অঞ্জু চলে যাওয়ার পর স্বামীকে বললেন, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে মেয়েকে চিরকুমারী রাখতে চাও।

এহতেশাম উদ্দিন হো হো করে হেসে উঠে বললেন, তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

এতে হাসির কি আছে? তাই তো মনে হচ্ছে। জান না, হাদিসে আছে, আল্লাহর রাসুল (দঃ) বলিয়াছেন, "ছেলেমেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে তাদের বিয়ে না দিলে তারা যদি কোনো পাপ করে, তা হলে মা বাবাও সেই পাপের ভাগি হবে?"

এহতেশাম উদ্দিন হাসি থামিয়ে বললেন, হাদিসে কি আছে না আছে জানি না। তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পার নি। আমার বলার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ না করুক, ভাগ্যচক্রে ভবিষ্যতে যদি আমার ব্যবসা ওকে চালাতে হয় তখন যেন কোনো অসুবিধেয় না পড়ে।

আমি বলি কি, অঞ্জু পড়াশোনা করতে থাকুক, তুমি ওর জন্য ছেলে সন্ধান করতে থাক। তেমন ছেলে পাওয়া গেলে বিয়ে দিয়ে দেব। জামাই ব্যবসা দেখবে আর ও পড়াশোনা করবে।

তুমি খুব ভালো কথা বলেছ, আমারও সেরকমই ইচ্ছা।

বাবার কথামতো অঞ্জু কমার্স নিয়ে এস. এস. সি. ও এইচ. এস. সিতে ভালো রেজাল্ট করে ঢাকা ভার্সিটিতে ম্যানেজমেন্টে অনার্সে এ্যাডমিশন নিল।

এহতেশাম উদ্দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বখতিয়ার সাহেবও বড় ব্যবসায়ী। ওনার দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়ে দুটির উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলে নাঈমের বিয়ে হয়েছে। বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করে। সবার ছোট ইয়াসীর এম. বি. বি. এস. পাশ করে উচ্চশিক্ষা নেয়ার জন্য ইংল্যাণ্ড গিয়েছিল। পড়াশোনা শেষ করে ফিরে না এসে সেখানেই এক হাসপাতালে চাকরি নিয়ে থেকে গেছে।

বখতিয়ার সাহেব তাকে বারবার আসতে বলেন। বড় ভাই, দু'বোন ও দুলাভাইরাও ফিরে আসার জন্য বারবার তাগিদ দেয়া সত্বেও আসে নি।

প্রায় পাঁচ বছর পর মা মৃত্যুশয্যায় শুনে ইয়াসীর দেশে ফিরল। বাসায় পৌঁছে মাকে সুস্থ দেখে অবাক হয়ে বলল, তোমরা তা হলে আমাকে মিথ্যে খবর দিয়েছ?

ইশরাত বেগম বললেন, মিথ্যে খবর না দিলে তো তুই আসতিস না।

তাই বলে এরকম খবর দেয়া তোমাদের উচিত হয় নি।

কত বছর তোকে দেখি নি, আমাদের বুঝি দেখতে ইচ্ছে করে না। যখন বাবা হবি তখন বুঝবি ছেলেমেয়ে অনেকদিন বিদেশে থাকলে মা বাবার মনে কি হয়।

রাতে খাওয়ার পর ইশরাত বেগম ছেলের রুমে গেলেন।

ইয়াসীর মাকে বসতে বলল।

ইশরাত বেগম বসে বললেন, মিথ্যে খবর দিয়ে আনিয়েছি বলে তুই কি রাগ করেছিস?

তোমার কঠিন অসুখের কথা শুনে খুব তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছে। তাই রাগ একটু হলেও তোমাদের সবাইয়ের মাঝে এসে তা নেই।

শোন, আমরা তোর বিয়ে দিতে চাই। বিয়ের কথা জানালে তুই আসবি না, তাই আমার অসুখের কথা জানিয়েছি।

বিয়ের কথা শুনে ইয়াসির খুব রেগে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর স্বরে বলল, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিয়ে করব না, চিরকুমার থাকব।

ইশরাত বেগম ফরেনের ছেলেমেয়েদের ফ্রি মিক্সিং-এর কথা জানেন, লিভ টুগেদারের কথাও জানেন। ভাবলেন, ছেলে ঐ দেশে গিয়ে ঐ সবের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাই বিয়ে করতে চাচ্ছে না। বললেন, ছি বাবা, ওরকম কথা বলতে নেই। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া চিরকুমার থাকার সিদ্ধান্ত নিতে নেই। তোর কি তেমন কোনো কারণ আছে?

না।

তা হলে আমরা তোর বিয়ে দেবই। তারপর একটা ছবি তার হাতে দিয়ে ইশরাত বেগম বললেন, এই মেয়েকে আমরা সবাই তোর জন্য পছন্দ করে রেখেছি। তোর বাবার বন্ধু এহতেশাম উদ্দিন সাহেবের মেয়ে। ম্যানেজমেন্টে অনার্স। এ রকম মেয়ে লাখে একটা আছে কিনা সন্দেহ। কথা শেষ করে বেরিয়ে গেলেন।

বখতিয়ার সাহেব স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে। সে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াসির কি বলল?

ছেলে যা কিছু বলেছে ইশরাত বেগম সে সব বলে মেয়ের ফটো দিয়ে আসার কথাও বললেন।

ও চিরকুমার থাকার সিদ্ধান্ত কেন নিল, ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পার নি?

না। তবে আমার মনে হয় অঞ্জুর ছবি দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। কাল আর একবার আলাপ করো। এবার ঘুমিয়ে পড় রাত অনেক হয়েছে।

মা বেরিয়ে যাওয়ার পর ইয়াসীর ছবি দেখে এত মুগ্ধ হল যে, বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কোনো মেয়ে যে এত সুন্দরী হয়, সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবল, ছবিতে যে মেয়েকে এত সুন্দরী দেখাচ্ছে, বাস্তবে সে কত না জানি সুন্দরী।

পরের দিন মাকে বলল, আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। বাবাকে তোমাদের পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বল।

ইয়াসির ছুটি নিয়ে এসেছিল। তাই বিয়ের পনের দিন পরে ইংল্যাণ্ড চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অঞ্জুর কাগজপত্র পাঠাব, পাঠিয়ে দিও।

কাগজপত্র তিন মাস পরে এলে অঞ্জুকে মা বাবা ও শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্লেনে তুলে দিলেন।

ইয়াসীর পালাম বিমান বন্দরে ছিল। অঞ্জুকে রিসিভ করে বাসায় নিয়ে গেল। প্রায় বছর খানেক বেশ সুখেই তাদের সংসার জীবন চলল। একদিন বিকেলে ফোন বেজে উঠতে অঞ্জু রিসিভ করতে মেয়েলী কণ্ঠ শুনতে পেল, কে ইয়াসীর?

আজ এক বছরের মধ্যে কোনো মেয়ে বাসায় ফোন করে ইয়াসিরকে চায় নি। তাই বেশ অবাক হয়ে অঞ্জু বলল, আপনি কে বলছেন?

আমি মরিয়ম, ইয়াসির কি বাসায় নেই?

না, এখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। কিছু বলার থাকলে বলুন, বাসায় ফিরলে জানিয়ে দেব।

আমি হাসপাতালে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

প্লীজ, আপনার পরিচয়টা বললে বাধিত হতাম।

আমি ওর ওয়াইফ।

কথাটা শুনে অঞ্জু চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, আপনাদের ম্যারেজ লাইফ কত দিনের?

প্রায় চার বছর। কিন্তু আপনি কে? এত কথাই বা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

অঞ্জুর মনে তখন ঝড় বইছে। মরিয়মের কথার উত্তর না দিয়ে রিসিভার ক্র্যাডেলে রেখে রাগে কাঁপতে লাগল। তার মনে হল সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। খাটের মাথার দিকে টেবিলে ফোনের সেট। আস্তে আস্তে খাটে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। ভাবল, এখানে বিয়ে করেছে সে কথা গোপন করে দেশে গিয়ে আমাকে আবার বিয়ে করল কেন? আবার ভাবল, মেয়েটা হয়তো তার গার্ল ফ্রেণ্ড। আমার সঙ্গে জোক করল। মনকে শক্ত করে ইয়াসীরের ওয়ার্ডরবের ড্রয়ার খুলে জামা কাপড় সরিয়ে কোনো চিঠিপত্র আছে কিনা খুঁজতে গিয়ে কয়েকটা চিঠি ও বিয়ের পোশাকে ইয়াসিরের সঙ্গে একটা সুন্দরী যুবতীর যুগল ফটো দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস হল, নিশ্চয় এই মেয়েই ফোন করেছে।

হাসপাতালে একটা অপারেশন ছিল বলে আজ ইয়াসিরের ফিরতে দেরি হল। বাসায় ঢুকে অঞ্জুর থমথমে মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অসুস্থ?

স্বামী হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলে অঞ্জু হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে ড্রেস পাল্টাতে সাহায্য করে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে চা নাস্তা খায়। আজ গেট খুলে দিয়ে তার কথার উত্তর না দিয়ে বেড রুমে চলে গেল।

ইয়াসির তার পিছন পিছন এসে বলল, কি ব্যাপার অঞ্জু, আমার কথার উত্তর দিলে না যে?

অঞ্জু রাগ চেপে রেখে বলল, মরিয়ম নামে একটা মেয়ে ফোন করেছিল, পরিচয় জানতে চাইলে বলল, সে তোমার স্ত্রী।

ইয়াসির চমকে উঠে সামলে নিয়ে বলল, তুমি কার কথা বলছ? আমি তো মরিয়ম নামে কোনো মেয়েকে চিনি না।

তুমি শুধু লম্পট নও, মিথ্যেবাদীও। মরিয়ম নামে কোনো মেয়েকে তুমি চেনো না নাহ? তারপর যুগল ফটোটা তার হাতে দিয়ে বলল, তা বিয়ের পোশাকে এই মেয়েটা কে?

ইয়াসির বুঝতে পারল, এখন আর মিথ্যে বলে কোনো লাভ হবে না। বলল, হ্যাঁ, প্রায় চার বছর আগে ওকে আমি বিয়ে করেছি।

অঞ্জু এতক্ষণ রাগ সহ্য করতে পারলেও আর পারল না, চিৎকার করে বলল, তা হলে আমাকে আবার বিয়ে করলে কেন?

প্লীজ অঞ্জু, অত উত্তেজিত হয়ো না। মরিয়মকে বিয়ে করার পরও তোমাকে কেন বিয়ে করেছি সব কিছু বলব। শুধু তুমি একটু শান্ত হও।

না, তোমার কোনো কথাই আমি শুনব না। তুমি শুধু আমার সঙ্গে না, তোমার ও আমার ফ্যামিলীর সবার সঙ্গে বেঈমানী করেছ। ছি ছি, তুমি এত নীচ ভাবতেই পারছি না।

ঠিক আছে, আমি না হয় নীচ, তবু আমার সবকিছু তোমাকে শুনতে হবে। শোনার পর তুমি যা বলবে মেনে নেব। তুমি তো আজ এক বছর এসেছ, কই, মরিয়মের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করতে দেখেছ? ও এখান থেকে এক হাজার মাইল দূরে এক হাসপাতালে চাকরি করে। বছরে একমাসের ছুটি নিয়ে আমার কাছে আসে। ও ছুটি না পেলে ফোন করে আমাকে যেতে বলে। তাই হয়তো ফোন করেছিল। এবার শোন কেন তোমাকে বিয়ে করলাম। শোনার পর নিশ্চয় আমার অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখবে।

না, আমি তোমার কোনো সাফাই শুনতে চাই না। আমি ভাবতেই পারছি না তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করবে। এখন এরুম থেকে যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

ইয়াসির চিন্তা করল, কিছুক্ষণ কাঁদলে ওর মনটা একটু হালকা হবে। তাই রুম থেকে বেরিয়ে এল।

অঞ্জু ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র আদরের মেয়ে। কিছুতেই ইয়াসিরকে সহ্য করতে পারল না। সে বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগল।

রাতে খাওয়ার জন্য ইয়াসির অনেক অনুনয় বিনয় করেও দরজা খোলাতে পারল না। শেষে সেও না খেয়ে ড্রইং রুমে রাত কাটাল।

পরের দিন সকালে ইয়াসির দরজা খোলার জন্য অনেক করে বলার পর অঞ্জু দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল, দু'একদিনের মধ্যে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করবে, নচেৎ আমি সুইসাইড করব।

তার কথা শুনে ইয়াসির মনে যেমন আঘাত পেল তেমনি আতঙ্কিতও হল। ছলছল চোখে বলল, এমন কথা বলতে পারলে? তোমাকে আমি কত ভালবাসি এই এক বছরেও কি বুঝতে পার নি? মরিয়মের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু বিয়ের পর বুঝতে পারলাম আগুনে ঝাঁপ দিয়েছি। সেই আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বেরোবার পথও মরিয়ম বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই বিয়ের কথা মা-বাবাকে জানাই নি। মায়ের অসুখের কথা জেনে দেশে এসে জানতে পারলাম, আমার বিয়ে দেয়ার জন্য পাত্রী ঠিক করে মিথ্যে খবর দিয়ে আনিয়েছে। প্রথমে আমি বিয়েতে রাজি না হয়ে বললাম, চিরকুমার থাকব। শুনে মা কারণ জিজ্ঞেস করল। আমি কিছু না বলে চুপ করে ছিলাম। মা তোমার একটা ফটো আমার হাতে দিয়ে বলল, এই মেয়েকে আমরা তোর জন্য পছন্দ করেছি। তারপর তোমার পরিচয় দিয়ে চলে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার ফটো দেখে মনে হল, মরিয়মকে বিয়ে করে যে আগুনে জ্বলছি, একমাত্র তুমিই আমাকে সেই আগুনের জ্বলন থেকে বাঁচাতে পারবে। তাই বিয়েতে রাজি হয়ে গেলাম। তবে ভেবেছিলাম, বিয়ের পরপর তোমাকে মরিয়মের ব্যাপারটা জানাব। কিন্তু জানাতে সাহস হয়নি। কারণ তোমার ভালবাসা আমার দগ্ধিত অন্তরে শান্তির স্রোত বইয়ে দিয়েছে। মরিয়মের কথা জানালে তুমি যদি আমাকে অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করে দূরে সরে যাও। সেজন্যে শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জানাতে পারি নি।

ইয়াসিরের কথা শুনে অঞ্জুর রাগ কমল না, বরং বাড়ল। রাগের সঙ্গেই বলল, তুমি যতই সাফাই গাও না কেন, আমি এখানে থাকব না। আমার দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে কি না বল?

তুমি বোধ হয় জান না, যে যাকে সত্যিকার ভালবাসে, সে তার জন্য হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জনও দিতে পারে।

অঞ্জু বিদ্রূপকণ্ঠে বলল, লম্পট ও প্রতারকের মুখে ভালবাসার কথা মানায় না। তবু বলব, আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে না। শুধু দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেই আমি ধন্য হয়ে যাব।

জানি, আমার কোনো কথাই তুমি বিশ্বাস করবে না। তবু কথা দিচ্ছি, তুমি যা চাচ্ছ তাই হবে।

ইয়াসির তার কথা রাখল, তিন দিনের মধ্যে অঞ্জুকে দেশে পাঠিয়ে দিল।

অঞ্জু ইয়াসিরের সবকিছু জানিয়ে মা বাবাকে বলল, তোমরা ডিভোর্সের ব্যবস্থা কর।

লুবাবা বেগম স্বামীকে বললেন, বখতিয়ার সাহেব বন্ধু হয়ে বন্ধুর মেয়ের এমন সর্বনাশ করতে পারলেন?

বাবা কিছু বলার আগে অঞ্জু বলল, ওনাদের কোনো দোষ নেই। ইয়াসির চার পাঁচ বছর আগে সেখানে বিয়ে করেছে ওনারা জানেন না।

এহতেশাম উদ্দিন বললেন, ঠিক আছে মা, তই যা চাস তাই হবে।

ইয়াসির ভেবেছিল, কয়েক মাস মা বাবার কাছে থাকলে অঞ্জুর রাগ পড়ে যাবে এবং চিঠি দিয়ে বা ফোন করে জানাবে মরিয়মকে ডিভোর্স দিলে সে ফিরে আসবে। কিন্তু ছ'মাস পরে ডিভোর্সের কাগজপত্র পেয়ে ভাবল, চিরকালের জন্য তার দেশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

ম্যানেজমেন্টে অনার্স করার পর অঞ্জুর বিয়ে হয়েছিল। এবার সে মাস্টার্স কমপ্লীট করল।

একদিন এহতেশাম উদ্দিন স্ত্রীর সামনে মেয়েকে বললেন, আমরা আবার তোর বিয়ে দিতে চাই। এ ব্যাপারে তোর কি ডিসিশন?

অঞ্জু বলল, আমি আর বিয়ে করব না।

কথাটা ভেবে চিন্তে বলছিস?

হ্যাঁ বাবা, আমি ভেবে চিন্তেই বলছি।

কিন্তু মা, দুনিয়া বড় কঠিন জায়গা। তুই কি একা একা জীবন কাটাতে পারবি? আর পারলেও দুনিয়ার মানুষ তোকে এতটুকু শান্তিতে থাকতে দেবে না। তুই আরো ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ।

অঞ্জু কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগে লুবাবা বেগম মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলল, কি করে সারা জীবন কাটাবি?

কেন? বাবার সঙ্গে ব্যবসার কাজ দেখাশোনা করব।

এহতেশাম উদ্দিন বললেন, তা না হয় করবি; কিন্তু আমাদের সোসাইটির লোকজন কি মনে করবে? বলবে, এহতেশাম সাহেব মেয়ের বিয়ে না দিয়ে নিজের ব্যবসায় লাগিয়েছে?

বললে বলবে, তাতে আমাদের কি? তারাতো আর আমাদেরকে খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে না?

কিন্তু মা বর্তমানে আমাদের দেশের সমাজের যে অবস্থা, যে দেশে মেয়েদের এতটুকু নিরাপত্তা নেই, যে দেশে অহরহ মেয়েদের মুখে এসিড মারছে, ধর্ষণ করছে, সে দেশে একটা মেয়ে একাকি জীবন কাটান খুব দুষাধ্য ব্যাপার। আমরা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন হয়তো তোকে আগলে রাখব; কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পর কি হবে?

কি আবার হবে? ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ওসব নিয়ে তোমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মেয়ের কথা শুনে লুবাবা বেগম রেগে উঠে বললেন, না, তোর কথা আমরা শুনব না। তুই এখন ছেলে মানুষ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোর এখনও কোনো জ্ঞান হয়নি।

অঞ্জু মায়ের রাগকে পাত্তা না দিয়ে মৃদু হেসে বলল, অনার্স করার পর এক বছর স্বামীর ঘর করে এসে মাস্টার্স করলাম, তারপরও আমাকে ছেলেমানুষ বলছ?

এহতেশাম উদ্দিন হেসে উঠে বললেন, তোর মা ঠিক কথা বলেছে। ছেলে-মেয়ে বুড়ো হয়ে গেলেও মা-বাবার কাছে ছেলে মানুষ।

স্বামী থেমে যেতে লুবাবা বেগম ভিজে গলায় বললেন, তুই আমাদের একমাত্র সন্তান। তোর ভবিষ্যৎ চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারি না। বিয়েতে অমত করিস নি মা। কথা শেষ করে চোখ মুছলেন।

অঞ্জু কিছু না বলে বাবার দিকে তাকাল। এহতেশাম উদ্দিন বললেন, তোর ব্যাপারে আমিও খুব চিন্তা করি। কিন্তু তোর মা আমার থেকে অনেক বেশি চিন্তা করে। সময় পেলেই আমাকে তোর বিয়ে দেয়ার জন্য তাগিদ দেয়। তুই রাজি না হলে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে কঠিন অসুখে পড়ে যাবে। তুই তো জানিস না, আমাদের সোসাইটির যারা তোর ডিভোর্সের কথা জেনে গেছে, তাদের অনেকে তোকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাব দিতে শুরু করেছে।

অঞ্জু বাবার কথা অবিশ্বাস করতে পারল না। কারণ তার বান্ধবীদের মধ্যে যারা ডিভোর্সের কথা জেনে গেছে, তাদের কেউ কেউ তাকে ভাবি করার প্রস্তাব দিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আসলে কি জান বাবা, সবাইয়ের নজর তোমার সম্পত্তির দিকে। তা না হলে জেনেশুনে ডিভোর্স মেয়েকে পুত্রবধূ করতে চাচ্ছে কেন?

তোর কথা অস্বীকার করব না; তবু বলব, সবাইয়ের নজর তো এক না। তাদের মধ্যে ভালো মন্দ খোঁজ নিয়ে সিলেক্ট করব।

না, ওদের মধ্যে না। অন্য কোনো ছেলের সন্ধান কর। যদি সেরকম ভালো কাউকে পাও আমাকে জানাবে। আমি তাকে পরীক্ষা করব। পাশ করলে পাশ, নচেৎ ক্যান্সেল। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার জন্য এতটুকু দুশ্চিন্তা করবে না। আমার চিন্তায় তুমি যদি অসুখ বাধিয়ে বস, তা হলে সত্যি সত্যি জীবনে আর বিয়েই করব না। আর শোন, কাল থেকে আমি বাবার সঙ্গে অফিসে যাব। যতদিন না তোমরা সে রকম ছেলে পাচ্ছ ততদিন অফিসে বাবাকে সাহায্য করব। আর সেই সাথে ড্রাইভিং শিখব। কুংফু শিখব। মাকে তার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চাইতে দেখে আবার বলল, ওসব শেখা থাকলে বিপদে পড়লে কাজে লাগবে। বাবা বলল শুনলে না, আজকাল সমাজের অবস্থা কত নোংরা হয়ে গেছে?

স্ত্রী কিছু বলার আগে এহতেশাম উদ্দিন বললেন, তোর কথা শুনে ভালো লাগছে। তোকে সব বিষয়ে পারদর্শী করব।

তানভীর দূর সম্পর্কের এক দুলাভাইয়ের বাসায় পেইংগেস্ট থাকে। দুলাভাই হাই কোর্টের উকিল। উনিই তাকে ড্রাইভারের চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছেন।

রংপুর থেকে ফেরার পর থেকে অঞ্জুকে একদণ্ডের জন্যও ভুলতে পারছে না তানভীর। তার কেবলই মনে হয় যার চোখ এত সুন্দর, সে দেখতে কত না সুন্দর। বাসায় গেলে নিশ্চয় মুখ ঢেকে তার কাছে আসবে না। ভাবল, যাওয়াটা কি ঠিক হবে? একটা এইট পাশ ছেলেকে কি সে মনে রেখেছে? এইসব চিন্তা করে মাস খানেক কাটিয়ে দিল। যত দিন যেতে লাগল দেখতে পাক বা না পাক তাদের বাসায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হতে লাগল। দিনে কাজে ব্যস্ত থাকলেও রাতে ঘুমাবার সময় যখন তার কথা মনে পড়ে তখন ভাবে, সামনের ছুটির দিন যাবে; কিন্তু ছুটির দিন এলে মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এসে জড়ো হয়। তাই যাওয়া হয় না। এভাবে আরো একমাস কেটে গেল।

একরাতে স্বপ্নে দেখল, সে যেন মৌচাক মার্কেটে মায়ের জন্য শাড়ি কিনতে গেছে। শাড়ি কিনে দোকান থেকে বেরোবার সময় একটা বোরখাপরা মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে শাড়ির প্যাকেটটা হাত থেকে পড়ে গেল। তানভীরের মনে হল, মেয়েটা ইচ্ছা করে তাকে ধাক্কা দিয়েছে। রেগে গেলেও কিছু না বলে প্যাকেটটা কুড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে মেয়েটি বলল, আপনি তানভীর না?

গলাটা তানভীর ভুলতে পারে নি। অঞ্জু ভেবে তার মুখের দিকে তাকাল, মুখে নেকাব ও চোখে রঙিন চশমা।

মেয়েটি চশমা খুলে বলল, চিনতে পারছেন না? আমি অঞ্জু।

চিনতে পেরে তানভীর সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন?

সালামের উত্তর দিয়ে অঞ্জু বলল, ভালো। সেদিনের উপকারের কথা কখনও ভুলব না। সেদিন ঠিকানা দিয়ে বাসায় আসতে বলেছিলাম, আসেন নি কেন? ঠিকানাটা আছে তো?

আছে।

আসুন না একদিন বাসায়।

ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আসব।

অঞ্জু বান্ধবী ইশরাতের সঙ্গে শপিং করতে এসেছে। এবার ইশরাত অঞ্জুকে বলল, চল না, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো।

অঞ্জু বলল, হ্যাঁ চল। তারপর তানভীরকে আসার আগে ফোন করতে বলে দোকানে ঢুকল।

স্বপ্নটা দেখার পর অঞ্জুদের বাসায় যাওয়ার ইচ্ছাটা প্রবল হল। থাকতে না পেরে এক বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে অঞ্জুদের বাসার গেটে নামল। তারপর ট্যাক্সি বিদায় করে দেখল, গেট বন্ধ। গেটের পাশে গ্রীলের ছোট গেট। সেটার ফাঁক দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাতে বেশ বড় ফুলের বাগান দেখতে পেল। বাগানে দু'জন লোক পানি দিচ্ছে। গেট থেকে বেশ দূরে বাগানটা। এদিক ওদিক তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাবল, এতদূর থেকে লোক দু'টোকে খুব জোরে না ডাকলে শুনতে পাবে না।

আসার আগে অঞ্জু ফোন করে আসতে বলেছিল। সেকথা মনে থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে ফোন করে নি। এখন তার মনে হল, ফোন করে আসাই উচিত ছিল। এরকম পরিস্থিতির জন্যই বোধ হয় ফোন করতে বলেছিল। এমন সময় একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের খাকি পোশাকে ইয়া মোচওয়ালা ষণ্ডা চেহারার একটা লোক এসে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

লোকটার পোশাক দেখে তানভীর বুঝতে পারল, দারোয়ান। বলল, গেট খুলুন, মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

দারোয়ান মুচকি হেসে মোচে তা দিতে দিতে বলল, এখানে কোনো মেম সাহেব থাকে না। যান, ভাগেন। পাগলামী করার আর জায়গা পেলেন না।

তানভীর আরো গম্ভীরস্বরে বলল, অঞ্জু এরকম একটা অভদ্রলোককে দারোয়ান রেখেছে জানা ছিল না। আজই বিদেয় করে দেয়ার কথা অঞ্জুকে বলতে হবে। ভালো চান তো গেট খুলে দিস।

তানভীরের সাধারণ পোশাক দেখে দারোয়ান তাকে ফালতু ছেলে মনে করে পাত্তা দেয় নি। এখন তার কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেও গেট না খুলে বলল, একটা কাগজে আপনার পরিচয় লিখে দিন। ছোট মেম সাহেবের হুকুম ছাড়া গেট খোলা নিষেধ।

আমার কাছে কাগজ কলম নেই। আপনি গিয়ে বলুন তানভীর এসেছেন।

একটু অপেক্ষা করুন বলে দারোয়ান চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে গেট খুলে দিয়ে বলল, সোজা চলে যান, ছোট মেম সাহেব দো'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

ভিতরে ঢুকে তানভীর দেখল, ফুলবাগানের পাশ থেকে চওড়া পাকা রাস্তা। গেট থেকে বাড়ির দূরত্ব দু'শ গজের কম হবে না। রাস্তার বাম পাশে ফুলের বাগান আর ডান পাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। ঠিক যেন খেলার মাঠ। বাড়ির দো'তলার বারান্দার দিকে তাকাতে শালওয়ার কামিজ পরা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। অঞ্জুকে বোরখাপরা অবস্থায় দু'বার দেখেছে। তাই চিনতে পারল না। ভাবল, এ হয়তো অঞ্জুর বড় বোন।

দারোয়ান এসে যখন অঞ্জুকে তানভীরের আসার কথা জানাল তখন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি। ভাবল, তাকে তো আসার আগে ফোন করতে বলেছিলাম। তবু মনের তাগিদে দারোয়ানকে গেট খুলে দিতে বলে দো'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। দূর থেকে দেখে সিওর হওয়ার পর একজন কাজের বুয়াকে বলেছিল, একজন মেহমান আসছে, নিচে গিয়ে অপেক্ষা কর। আসার পর ড্রইংরুমে বসাবে।

বুয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তানভীর আসার পর তাকে বলল, আমার সঙ্গে আসুন। ড্রইংরুমে এসে বলল, আপনি বসুন। ছোট মেম সাহেব একটু পরে আসবেন। তারপর রুম থেকে চলে গেল।

তানভীর রুমের পরিবেশ দেখে বুঝতে পারল, অঞ্জুর বাবা খুব ধনী লোক ছিলেন। এত দামি সোফাসেটে বসা উচিত হবে না ভেবে মেঝেয় পাতা কার্পেটের উপরে বসে ভাবতে লাগল, এত বড় লোকের মেয়ে হয়ে অঞ্জু কি তাকে মনে রেখেছে?

এমন সময় সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর তার কানে এল, "আরে, আপনি মেঝেয় বসে আছেন কেন? উঠে সোফায় বসুন।"

অঞ্জুর কণ্ঠস্বর শুনে তানভীর দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে তার দিকে তাকাল। এত অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখেনি। কণ্ঠস্বর না শুনলে তাকে চিনতেই পারত না। বোরখাছাড়া অঞ্জুর সৌন্দর্য দেখে ও চোখের দিকে তাকিয়ে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

অঞ্জু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও কিছু বলল না। হাসি মুখে সেও তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর বলল, কি হল? দাঁড়িয়েই থাকবেন?

সোফায় বসবে কিনা তানভীর চিন্তা করতে লাগল।

অঞ্জু তার মনোভাব যেন বুঝতে পারল। বলল, সোফায় বসতে দ্বিধা করছেন কেন? না বসলে বরং অপমান বোধ করব।

তানভীর বসার পর অঞ্জুও বসল। তারপর বলল, আপনাকে তো আসার আগে ফোন করতে বলেছিলাম। ফোন করলে দারোয়ানকে বলে রাখতাম।

তানভীর মৃদু হেসে বলল, কথাটা মনে থাকলেও ইচ্ছা করে করি নি।

কেন বলুন তো?

আপনাদেরকে জানার জন্য।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সাধারণ মানুষেরা শহরের ধনীদের সঙ্গে দেখা করতে এলে কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় জানার জন্য।

অঞ্জু মৃদু হেসে বলল, আপনি তো দারুণ ছেলে? তা কেমন আছেন বলুন।

ভালো, আপনি?

আমিও ভালো। কি খাবেন?

কিছু না।

সে কি? সামান্য কিছু অন্তত খান। চা, কফি, তার সঙ্গে হাল্কা কিছু নাস্তা?

না, কিছুই খাব না।

কেন বলুন তো? আপনার পেটের কি কোনো ট্রাবল আছে?

পেটের ট্রাবল নেই, মনের ট্রাবল আছে।

মানে?

আপনি শিক্ষিতা, মানেটা বুঝতে পারা উচিত ছিল। যাই হোক বলছি, সেদিন আপনি আমার বায়োডাটা নিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন। ভেবেছিলাম, আমাকে একটা ভালো জব দেবেন। সেরকম কোনো আভাস পাচ্ছি না। তাই মনের ট্রাবল শুরু হয়েছে।

অঞ্জু খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, আপনার অনুমান ঠিক। আপনি আমার খুব বড় উপকার করেছিলেন। একটা ভালো জব দিয়ে সেই উপকারের ঋণ শোধ করার জন্যই আসতে বলেছিলাম। কিন্তু আপনি প্রথম থেকেই এমন কথাবার্তা আরম্ভ করেছেন, সে কথা বলার চান্স পাচ্ছি না। এবার মনে হয় মনের ট্রাবল নেই বলে অঞ্জু আবার হেসে ফেলল।

তানভীরও হেসে ফেলে বলল, না নেই।

তা হলে এখন আর নাস্তা খেতে আপত্তি নেই নিশ্চয়?

না, নেই। এখন নাস্তার সঙ্গে বিষ দিলেও খাব।

তানভীরের সঙ্গে যত কথা বলছে অঞ্জু তত মুগ্ধ হচ্ছে। এরকম ছেলে সে আর দেখে নি। তার বিষ খাওয়ার কথা শুনে আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

তানভীর বলল, বেশি হাসবেন না। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে শুনেছিলাম, "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে ফজলু মান্না।"

হাসি থামিয়ে অঞ্জু বলল, ফজলু মান্না আবার কে? কোনো মনিষি টনিষি না কি?

মনিষি টনিষি কি না জানি না, তবে ফজলু একটা মানুষের নাম। আর মান্না হল পদবী।

এমন সময় বুয়া টী টেবিলে নানারকম নাস্তার আইটেম নিয়ে রুমে ঢুকল। তার পিছনে লুবাবা বেগমও এলেন।

অঞ্জুর সঙ্গে লুবাবা বেগমের চেহারার মিল দেখে তানভীর বুঝতে পারল অঞ্জুর মা। দাঁড়িয়ে সালাম দিল।

লুবাবা বেগম সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, দাঁড়ালে কেন? বস। আমি অঞ্জুর মা। রংপুর থেকে ফিরে অঞ্জু তোমার কথা আমাকে বলেছে। সেদিন ওর অনেক বড় উপকার করেছ। তুমি এসেছ, খুব খুশী হয়েছি।

অঞ্জু মাকে বলল, উনি ড্রাইভারের চাকরি করেন। ভাবছি, ওনাকে আমার গাড়ির ড্রাইভারের চাকরি দেব।

তোকে তো কবে থেকে ড্রাইভার রাখার কথা বলছি। ভালো বুঝলে ওকেই রেখে দে। তারপর তানভীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, অঞ্জু তোমার বায়োডাটা দেখিয়েছে। তোমরা নাস্তা খাও, আমি যাই বলে লুবাবা বেগম চলে গেলেন।

বুয়া আগেই চলে গেছে। অঞ্জু তানভীরকে বলল, খাওয়ার ব্যাপার নিজস্ব রুচি, তাই না?

হ্যাঁ, তাই।

তা হলে বলুন আপনাকে কি কি দেব।

আপনি যা যা খাবেন, আমাকেও তাই তাই দিন।

তা কি করে হয়? নিজস্ব রুচির কথা এক্ষুনি স্বীকার করে এরকম কথা বলছেন কেন?

আপনার রুচির সঙ্গে আমারটার মিল আছে কি না জানার জন্য।

আমি তো এসময় বিস্কুট আর চা খাই।

আমিও তাই। দেখলেন তো, আপনার সঙ্গে আমার কতটা মিল?

অঞ্জু কিছু বলল না। মৃদু হেসে চা-বিস্কুট পরিবেশন করে নিজেও নিল। এমন সময় একজন পৌঢ় মহিলাকে আসতে দেখে তানভীর চায়ের কাপ টেবিলের উপর রেখে সালাম দিল।

অঞ্জুর পিছন দিকে ড্রইংরুমের দরজা। তাই সে ওনাকে দেখতে পাইনি। তানভীরকে সালাম দিতে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে দাদিকে দেখে বলল, আসুন দাদি বসুন।

জমিলা বেগম তানভীরের সালামের উত্তর দিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাকে দেখে ওনার ছোট ছেলে সামুসুদ্দিনের কথা মনে পড়ল। ছেলেটা দেখতে অনেকটা তারই মতো। যখনই সামসুদ্দিনের কথা মনে পড়ে তখনই চোখে পানি এসে যায়। এখনও তাই হল।

অঞ্জু অধৈর্য গলা বলল, কি হল দাদি? বসবেন তো। আমরা একটা ব্যাপারে আলাপ করছি।

নাতনির কথা শুনে চোখ মুছে সংযত গলায় বলল, তা হলে আমি যাই?

অঞ্জু দাদির চোখের পানি লক্ষ্য করে নি। বলল, আপনিও থাকুন। আলাপটা আপনারও শোনা দরকার। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে তানভীরকে বলল, আপনি কি আমার কাছে চাকরি করবেন?

করব, তবে শর্ত আছে।

বলুন কি শর্ত?

আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

যেমন?

কোনো রকম অন্যায় কাজ করার আদেশ করতে পারবেন না।

আর কিছু?

বাসার কোনো কাজ করতে পারব না। তবে অফিসের কোনো কাজে আপত্তি নেই। আর কাজে জয়েন করার দিন একমাসের বেতন এ্যাডভান্স দিতে হবে।

ঠিক আছে, তা হলে এবার কাজের কথায় আসি। যেখানে কাজ করছেন ওখানে বেতন কত পাচ্ছেন?

পাঁচ হাজার।

আমি আট হাজার দেব। খুশী তো?

খুশী।

আপনি কি সাহেবের বাসায় থাকেন?

না। এক আত্মিয়ের বাসায় পেইংগেষ্ট থাকি।

আমার কাছে কাজ নিলে এখানেই থাকতে হবে।

আপত্তি নেই; তবে কারো সঙ্গে শেয়ারে থাকতে পারব না। আমাকে আলাদা একটা রুম দিতে হবে।

ঠিক আছে, তা দেয়া যাবে। কবে থেকে জয়েন করবেন বলুন।

এখন বলা যাবে না। সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে জানাব।

আর কিছু বলার আছে?

না, তবে দু'একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছা করছে?

বলুন কি জানতে ইচ্ছা করছে।

আপনাদের কি ব্যবসা আছে?

আছে?

ব্যবসা দেখাশোনা করেন কে?

আমি।

কোনো পুরুষ, মানে আপনাদের আপনজন কেউ এখানে থাকেন না?

আপনজন তেমন কেউ নেই। এক মামা আছেন, তিনি অফিসের ম্যানেজার। বনানীতে নিজস্ব বাড়িতে থাকেন?

আপনার দাদাজী আছেন?

না, উনি বাবার বিয়ে হওয়ার আগে মারা গেছেন।

এত বড় বাসায় শুধু আপনি, আপনার মা ও দাদি থাকেন। ভয় করে না?

কিসের ভয়? দু'জন মালি, দু'জন কাজের লোক ও দারোয়ান আছে।

আজকাল সন্ত্রাসীতে দেশ ছেয়ে গেছে। শুনেছি, ওদেরকে হাত রাখার জন্য বিত্তবানদের মাসে মাসে মোটা টাকা চাঁদা দিতে হয়। না দিলে ধন-মান-জান সব হারাতে হয়। আপনারাও কি টাকা দিয়ে ওদেরকে হাত করে রেখেছেন?

ওসব ব্যাপার আমি জানি না। মামা প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিন এখানে থাকেন। মায়ের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটান। মামা সন্ত্রাসীদের টাকা দেন কিনা তা জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি সন্ত্রাসীদের খুব ভয় পান বুঝি?

ওদেরকে কে না ভয় পায়? তবে আমি পাই না।

কেন?

আমার মতো ওরাও মানুষ। তা ছাড়া আমি তো কোনো অন্যায় করি নি, বরং ওরাই করছে। যারা অন্যায় করে তারাই ভালো মানুষদের ভয় পায়।

কিন্তু ভালো মানুষরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তো সন্ত্রাসীরা তাদেরকে মেরে ফেলে।

তা জানি, তবে একথাও ঠিক, সন্ত্রাসীরাও যে প্রতিদিন বিভিন্ন কারণে মরছে তা প্রতিদিন দৈনিক কাগজ পড়লেই জানা যায়। এসব কথা থাক, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। সেজন্য ক্ষমা চাইছি। তারপর অঞ্জু কিছু বুঝে ওঠার আগে দাঁড়িয়ে এবার আসি বলে সালাম দিয়ে তানভীর রুম থেকে বেরিয়ে এল।

অঞ্জু তার ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলে অস্ফুটস্বরে বলল, অনেক পাগল দেখেছি; কিন্তু এরকম পাগল আর দেখি নি। তবে খুব সহজ সরল। তাই না দাদি?

জমিলা বেগম এতক্ষণ তানভীরকে লক্ষ্য করছিলেন। শুধু যে সামসুদ্দিনের মতো দেখতে, গলার স্বরও যে তার মতো তাই নয়, কথা বলার ভঙ্গিও হুবহু তার মতো। এইসব দেখে কান্না পাচ্ছিল। ইকবাল সাহেব মারা যাওয়ার আগে স্ত্রী ও বড় ছেলেকে বলেছিলেন, আমার ভবিষ্যৎ বংশধররা যেন সামসুদ্দিনের কথা না জানে। তাই তার কথা অঞ্জু বা লুবাবা বেগম জানেন না। তার কথা মনে পড়লে যখন কান্না পায় তখন নিজের রুমে গিয়ে কাঁদেন। এখনও চোখ থেকে পানি পড়ছিল। নাতনির কথা শুনে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, হ্যাঁ, তোর কথা ঠিক, ছেলেটা খুব সরল সহজ।

জমিলা বেগম চোখ মুছার আগে অঞ্জু ওনার চোখ থেকে পানি পড়তে দেখেছে। তাই বলল, আপনার চোখে পানি কেন? তারপর বুকের কাপড় ভিজে দেখে বলল, মনে হচ্ছে এখানে আসার পর থেকে কাঁদছিলেন?

জমিলা বেগম কান্নামুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, অনেক দিন আগের একটা দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ল, তাই চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল।

কি দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলুন তো?

সেসব বলা যাবে না। আর তোর শোনাও উচিত হবে না বলে জমিলা বেগম তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন।

অঞ্জু চিন্তা করল, কি এমন ঘটনা, যা আমার শোনা উচিত হবে না? বিড় বিড় করে বলল, যেমন করে হোক সময় মতো একদিন দাদির কাছে ঘটনাটা জানতে হবে।

মাসের পঁচিশ তারিখে বাসায় ফিরে তানভীর দুলাভাইকে বলল, চাকরিটা ইস্তফা দিয়ে এলাম।

সে কী! চাকরিতে ইস্তফা দিলে কেন?

পাঁচ হাজার টাকা বেতনে আর কতদিন করব? সাহেবকে দশ হাজার টাকা বেতনের কথা বলতে বললেন, "পাঁচ হাজারেই তোমার চেয়ে কত ভালো ড্রাইভার পাওয়া যায়। ইচ্ছা হলে ঐ বেতনেই কর, নচেৎ বিদায় হও।" তাই আমিও ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম।

দুলাভাই জানে শালা বেশ খেয়ালী ও একরোখা। তাই ঐ ব্যাপারে আর কিছু না বলে বললেন, মাসের শেষে এ মাসের বেতন নিয়ে ইস্তফা দিতে পারতে।

আমাকে অত বোকা ভাবলে কি করে? চলতি মাসের বেতন এক তারিখে এ্যাডভান্স নিয়ে নিই।

অন্য কোথাও ঠিক না করে হুট করে ইস্তফা দেয়া তোমার উচিত হয় নি।

আরে দুলাভাই, আমি অত কাঁচা ছেলে না, থাকা খাওয়া ফ্রি ও বেতন আট হাজার ঠিক করেই ইস্তফা দিয়েছি।

তাই নাকি? তা হলে তো উচিত কাজই করেছ। তা নতুন চাকরিতে কবে জয়েন করছ?

সামনের মাসের এক তারিখে।

ভালো, খুব ভালো। আমি বলি কি, থাকা খাওয়ার বদলে নতুন সাহেবকে বেতন কিছু বাড়িয়ে দিতে বল। তা হলে দু'রুমের একটা ফ্লাট ভাড়া করে মাকে নিয়ে এসে থাকতে পারবে।

কথাটা তুমি ভালই বলেছ। তবে কি জান, এখন কথাটা বলা ঠিক হবে না। কয়েকমাস যাক তারপর বলব।

আজ প্রায় এক মাস হতে চলল, তানভীর অঞ্জুর গাড়ির ড্রাইভারী করছে। মালি, কাজের লোক ও ড্রাইভারদের থাকার জন্য গেটের পাশে আলাদা পাকা টিনসেড দু'তিনটে রুম থাকলেও অঞ্জু বাড়ির নিচ তলার দুটো গেষ্টরুমের একটাতে তার থাকার ব্যবস্থা করেছে। ঐ রুমটা ফুল বাগানের দিকে। রুমের সঙ্গে বারান্দা আছে। বারান্দা গ্রীল দিয়ে ঘেরা থাকলেও বাগানে যাওয়ার জন্য গেট আছে। তানভীর রাত বারটা একটা পর্যন্ত বড় লাইট অফ করে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কাজ করে। সে সময় জানালা কপাট লাগিয়ে পর্দা টেনে দেয়। ফলে বাসার কেউ অথবা কাজের লোকেরা কেউ জানতে পারে না। জ্যোৎস্না রাতে টেবিল ল্যাম্প অফ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুল বাগানের দিকে তাকিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। অনেক সময় ঐ ভাবে থাকতে থাকতে ভোর হয়ে যায়। মসজিদ থেকে ফজরের আজান কানে এলে বাস্তবে ফিরে আসে। তারপর অযু করে নামায পড়ার পর কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করে তফসীর পড়ে।

প্রথম দিন অঞ্জু যখন এই রুমে তানভীরের থাকার ব্যবস্থা করে তখন লুবাবা বেগম আপত্তি করে বললেন, এটা তুই ঠিক করলি না, ড্রাইভারের সঙ্গে থাকতে না চাইলে পাশের রুম খালি রয়েছে, সেখানে ব্যবস্থা করতে পারতিস। তোর মামা জানলে অসন্তুষ্ট হবে।

অঞ্জু বলল, তুমি ঠিক কথা বলেছে মা; কিন্তু কেন তা করলাম না পরে জানতে পারবে। আর মামা কিছু বললে তাকে যা বলার আমি বলব।

পরের দিন সাপ্তাহিক ছুটি। অঞ্জুর মামা মোজাম্মেল সাহেব বোনের বাসায় এলে অঞ্জু তানভীরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, উনি আমাদের অফিসের শিয়নের কাজও করবে। তারপর তানভীরের বায়োডাটা ওনার হাতে দিলেন।

বায়োডাটা পড়ে মোজাম্মেল সাহেব তানভীরের আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা তোমার লেখা?

তানভীর বলল, জি।

তোমার হাতের লেখা খুব সুন্দর। আরো পড়াশোনা করলে না কেন?

তানভীর কিছু না বলে চুপ করে রইল।

ঠিক আছে, অঞ্জু যখন তোমাকে সিলেক্ট করেছে তখন আমার কিছু বলার নেই। এবার তুমি যাও।

তানভীরকে বাসার ভিতরে যেতে দেখে বোনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওকি এই বাড়িতেই থাকে?

লুবাবা বেগম মেয়ের দিকে তাকালেন।

অঞ্জু বলল, নিচতলার গেস্টেরুমে ওর থাকার ব্যবস্থা করেছি।

কাজটা মোটেই ভালো করিস নি মা। ওর সম্পর্কে তুই কিছুই জানিস না। শুধু বায়োডাটা দেখে এতটা বিশ্বাস করা একদম উচিত হয় নি। কাজের লোকজনদের একটা রুমে থাকার ব্যবস্থা করতে পারতিস। জানাশোনা ছাড়া কোনো অচেনা মানুষকে বাসাতে থাকতে দেয়ার মতো বোকামী আর নেই। আজকাল মানুষ চেনা খুব কঠিন। কার মনে কি আছে, তা কেউ বলতে পারে না। না-না, এটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না।

লুবাবা বেগম বললেন, আমিও ওকে নিষেধ করে ড্রাইভারের পাশের রুমে থাকার কথা বলেছিলাম, শোনে নি।

অঞ্জু বলল, ওকে দেখে কি তোমাদের খারাপ কিছু মনে হয়েছে?

মোজাম্মেল সাহেব বললেন, না, তা মনে হয় নি। বরং ভদ্রঘরের ছেলে বলে মনে হল। কিন্তু কি জানিস মা, মানুষকে দেখে তার ভেতরটা জানা যায় না। যারা দুষ্কৃতিকারী তারাও দেখতে খারাপ না।

তোমরা ওর ভিতরটা জানতে না পারলেও আমি পেরেছি। তাই এখানে থাকতে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, আমার জানার মধ্যে কোনো ভুল হয় নি।

ঠিক আছে মা, তোর কথা মেনে নিলাম। তবু বলব, ওর ব্যাপারে তোমরা সজাগ থেক।

এই একমাসের মধ্যে লুবাবা বেগম বা মোজাম্মেল সাহেব তানভীরের মধ্যে খারাপ কিছু দেখতে পেলেন না। বরং তার চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলেন।

মাস দুয়েক পরে একদিন অফিসে যাওয়ার পথে অঞ্জু তানভীরকে বলল, আপনার বেতন দু'হাজার বাড়িয়ে দেব, সেজন্য আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

বলুন কি কাজ, অন্যায় কিছু না হলে আপত্তি নেই।

আপনাকে কুংফু শিখতে হবে।

জেনেও নাজানার ভান করে তানভীর বলল, কুংফু আবার কি জিনিস?

কংফু হল, প্রতিপক্ষের আক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা করার ও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কলাকৌশল।

তাই নাকি? তা হলে তো এটা সবারই শেখা উচিত।

হ্যাঁ, তাই তো আপনাকে শেখার জন্য বললাম।

ঠিক আছে শিখব; কিন্তু এজন্য বেতন বাড়াবেন কেন বুঝতে পারছি না।

আমার একজন বডিগার্ড দরকার। আপনাকে সেই কাজটাও করতে হবে। বডিগার্ডের কুংফু জানা আবশ্যক। নচেৎ সন্ত্রাসীরা আমার ক্ষতি করতে চাইলে আমাকে রক্ষা করবেন কি করে? শুধু তাই নয়, কুংফু শেখার পর সুটিং ও শিখতে হবে।

সুটিং আবার কি জিনিস?

বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ও রিভলবার চালানো।

আমার তো ওসবের কোনোটাই নেই।

শেখার পর আমি আপনাকে একটা রিভলবার কিনে দেব। কি, রাজি তো?

রাজি। দু'একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে।

কি কথা?

এব্যাপারে আপনার মামা ও মায়ের সঙ্গে আলাপ করেছেন?

আপনি কিন্তু সীমার বাইরে প্রশ্ন করছেন।

সরি, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। গার্জেনদের সঙ্গে পরামর্শ করে সবকিছু করা উচিত ভেবে কথাটা বলেছি।

সে কথা আমিও জানি। ভবিষ্যতে সীমার বাইরে প্রশ্ন করবেন না। আর কিছু জানতে চান?

আর একটা। যে সব আমাকে শেখাতে চাচ্ছেন, সে সব আপনি শিখেছেন?

হ্যাঁ, শিখেছি।

ঐ দিন অফিস ছুটির পর অঞ্জু তানভীরকে নিয়ে কুংফু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে বাসায় ফিরল।

চার-পাঁচ মাসের মধ্যে তানভীর কুংফু ও সুটিং শেখার পর অঞ্জু তাকে লাইসেন্সসহ একটা রিভলবার কিনে দিল।

রংপুর থেকে ফেরার পথে তানভীরের সুন্দর চেহারা ও কথা-বার্তা অঞ্জুর কাছে ভালো লাগে। ভেবেছিল, ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলে। কোনো কারণে

ড্রাইভারের চাকরি করছে। একটা ভালো চাকরি দিয়ে প্রত্যুপকার করার উদ্দেশ্যে তাকে বায়োডাটা দিতে বলে। বায়োডাটায় এইট পাশ জেনে বিশ্বাস করতে পারে নি। কারণ এইট পাশ ছেলের হাতের লেখা এত ভালো হতে পারে না। তা ছাড়া ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলের মতো কথা-বার্তা বলতেও পারে না। তাই তাকে বাসার ঠিকানা দিয়ে আসতে বলে।

তিন মাস পরে তানভীর তাদের বাসায় আসে। এই তিন মাসের মধ্যে প্রায় প্রতিদিন তার কথা মনে পড়েছে। কেন পড়েছে তা নিজেই জানে না। ইয়াসিরের সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পর পুরুষ জাতটার উপর তার প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মায়। তাই মা বাবাকে জানিয়েছিল, সে আর বিয়ে করবে না। তানভীরের কথা যখন মনে পড়ে তখন তার মনটা উদাস হয়ে যায়। কোনো কিছু ভালো লাগে না। ভাবে, ছেলেটা এল না কেন? তা হলে কি অন্য কোথাও ভালো চাকরি পেয়ে গেছে? মাঝে মাঝে তার মন তাকে শাসায়, তানভীরের কথা তুই ভাবছিস কেন? তুই পুরুষ জাতটাকে তো ঘৃণা করিস? মনের শাসনে অঞ্জু শান্তি পায়। তানভীরের চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দেয়। তিন মাস পর তানভীর যখন বাসায় প্রথম এল তখন অঞ্জুর মন আনন্দে ঝলসে উঠল। তারপর তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারল, সে শিক্ষিত ও খুব সহজ সরল। কেন সে কোয়ালিফিকেশন গোপন করছে, জানার জন্য ও মনের তাগিদে মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও গেস্টরুমে থাকতে দিয়েছে।

চাকরিতে ঢোকার আগি তানভীর বলে নিয়েছিল। শক্রবার তাকে ছুটি দিতে হবে। তারপর যখন অঞ্জুর বডিগার্ডেরও দায়িত্ব নিল তখনও ঐ নিয়ম বহাল আছে, তবে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া।

দারোয়ান, কাজের লোক ও মালিদের খাওয়ার রুম আলাদা। কিন্তু তানভীর সেখানে খায় না। কাজের বুয়া তার রুমে খাবার দিয়ে যায়। ব্যবস্থাটা অঞ্জুই করেছে। লুবাবা বেগম অবশ্য আপত্তি করেছিলেন, অঞ্জু শোনে নি।

অঞ্জু মায়ের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। তাই একদিন মেয়েকে বললেন, একটা অল্প শিক্ষিত ড্রাইভারের জন্য তুই যা করছিস, তা উচিত হচ্ছে না।

অঞ্জু মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার পেটে জন্মেছি, আমাকে কখনও এতটুকু অন্যায় করতে দেখেছ?

আমি তো অন্যায়ের কথা বলি নি, উচিত-অনুচিতের কথা বলেছি।

উচিত-অনুচিত আমি বুঝি না, আমার শিক্ষা, আমার বিবেক আমাকে যতটুকু করতে বলছে ততটুকু করছি। আর আমি যে কোনো ভুল করছি না, একদিন তা প্রমাণ করে দেখাব।

লুবাবা বেগম মেয়ের কথায় সন্তুষ্ট হতে না পারলেও আর কিছু বললেন না।

একদিন রাত দু'টোর সময় লোডশেডিং-এর ফলে গরমে অঞ্জুর ঘুম ভেঙে গেল। তখন ভাদ্র মাস। প্রচণ্ড গুমোট। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। ঘুম ভেঙে যেতে অঞ্জু বুঝতে পারল, ঘামে বালিশ ভিজে গেছে। নাইটি পরে ঘুমিয়েছিল। ঐ অবস্থায় বারান্দায় বেরিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াল। চারদিকে জ্যোৎস্না থৈ থৈ করছে। ফুল বাগনের দিকে তাকিয়ে মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হল। এরআগে কোনোদিন এত রাতে বারান্দায় বেরিয়ে পূর্ণিমার আলোর দৃশ্য দেখে নি। মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। হঠাৎ নিচের বারান্দায় কাশির শব্দ শুনতে পেল। ভাবল, নিশ্চয় তানভীর। সে তার রুমের বরাবর নিচের রুমে থাকে। তাকে দেখার জন্য যখন ঝুঁকল ঠিক তখনই কারেন্ট চলে এল। দেখল, লুঙ্গী পরে খালি গায়ে ফুল বাগানের দিকে তাকিয়ে গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। খালি গায়ে তানভীরকে কখনও দেখেনি। আজ দেখে মুগ্ধ হল। চওড়া পেটাই বুকে লোমে ভরা। দৃশ্যটা বেশিক্ষণ দেখতে পেল না। কারেন্ট আসার মিনিটখানেকের মধ্যে তানভীর রুমে ঢুকে গেল।

তাকে আরো ভালো করে দেখার মনে প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করল। ভুলে গেল, একটা ড্রাইভারের রুমে এতরাতে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। রুমে ঢুকে নাইটির উপর একটা চাদর জড়িয়ে নিচে নেমে এসে তার দরজায় আঙ্গুল দিয়ে টক টক শব্দ করল।

তানভীর বাথরুম থেকে অযু করে এসে তাহাজ্জুতের নামায পড়ার জন্য মসাল্লা বিছিয়েছে। এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ শুনে খুব অবাক হল। ভাবল, লোডশেডিং-এর সময় ডাকাতরা ঢুকে পড়েনি তো? কি করা উচিত চিন্তা করতে লাগল। বিরতি নিয়ে কয়েকবার শব্দ হতে রিভলবারটা হাতে নিয়ে বলল, কে?

আমি অঞ্জু, দরজা খুলুন।

খুব টেনসানে ছিল বলে হঠাৎ তানভীরের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'এনিথিং রং'?

নো, প্লীজ ওপেন দা ডোর।

তানভীর দরজা খুলতেই অঞ্জু ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

তানভীর বলল, কী ব্যাপার বলুন তো?

অঞ্জু দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসতে গিয়ে টেবিলের উপর কয়েকটা প্লাষ্টিকের ফাইল ও একটা খাতার উপর একটা কলম দেখে খুব অবাক হল।

তানভীরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খোলা খাতাটা বন্ধ করে বলল, হঠাৎ এতরাতে এলেন কেন বলবেন তো?

অঞ্জু তার কথার উত্তর না দিয়ে বন্ধ খাতাটা খুলে ইংরেজিতে লেখা কয়েক পাতা পড়ে বুঝতে পারল, বর্তমান মুসলমানদের অবনতির কারণ ও তার প্রতিকারের উপর থিসিস।

খাতাটা বন্ধ করে তানভীরের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার বাংলার চেয়ে ইংরেজি লেখাটা আরো সুন্দর। তারপর জিজ্ঞেস করল, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন কেন?

ধরা পড়ে তানভীর খুব লজ্জা পেল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, এখন আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। দয়া করে এতরাতে কেন এসেছেন বলে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান।

এতরাতে না এলে তো আপনাকে আবিস্কার করতে পারতাম না। তারপর মসল্লা বিছান দেখে বলল, আপনি নামায পড়েন?

পড়ি। আপনি পড়েন না?

না।

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর নামায পড়া একান্ত কর্তব্য।

কই, আপনাকে তো কখনও নামায পড়তে দেখি নি?

এই কথার উত্তর না দিয়ে তানভীর বলল, প্লীজ, আপনি এখন যান।

বারবার কেন চলে যেতে বলছেন বলুন তো?

গভীর রাতে একজন যুবকের ঘরে একজন যুবতী মেয়ের প্রবেশ করা কি উচিত? তা ছাড়া বাসার কেউ জেনে গেলে কি হবে তা নিশ্চয় জানেন?

জানি। তবু কেন এসেছি বুঝতে পারছেন না?

না, বুঝতে পারি নি।

কথাটা সত্য না মিথ্যা?

অর্ধেক সত্য, অর্ধেক মিথ্যে।

অঞ্জু মৃদু হেসে বলল, আর আমি যদি বলি পুরোটাই মিথ্যে?

তা বলতে পারেন, আমি কিন্তু যা সত্য তাই বলেছি।

অঞ্জু আর কিছু না বলে মৃদু হাসতে হাসতে তার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, কাল অফিস বন্ধ, ছুটি নেই, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবেন। কথা শেষ করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন নাস্তা খেয়ে বেরোবার সময় অঞ্জু মাকে বলল, মামা আমার খোঁজ করলে বলো, একটা কাজে গেছি।

গাড়ি রাস্তায় আসার পর তানভীর জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

অঞ্জু বলল, কোনো নিরিবিলি পার্কে চলুন। আপনার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে।

আজকাল নিরিবিলি পার্ক নেই। তারচেয়ে নৌকা ভ্রমণে চলুন। আনন্দও পাবেন আর গুরুত্বপূর্ণ আলাপও করতে পারবেন।

ঠিক আছে, তাই চলুন।

তানভীর বাদামতলী ঘাটে এসে গাড়ি পার্ক করে অঞ্জুকে নামতে বলল।

অঞ্জু ফ্লাক্সে কফি তৈরি করে নিয়ে এসেছে। সেটা নিয়ে নেমে বলল, আপনি কিছু ভালো বিস্কুট ও কেক কিনে নিয়ে আসুন।

তানভীর বিস্কুট ও কেক নিয়ে এসে একটা বড় নৌকা তিন ঘণ্টার জন্য ভাড়া করে অঞ্জুকে নিয়ে উঠল।

নৌকাটায় ছাউনি আছে। ছাউনির ভিতর সপের পাটি বিছান। মাঝি তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী মনে করে বলল, আপনারা ছাউনির ভিতরে গিয়ে বসুন, বাইরে কড়া রোদ।

তানভীল বলল, কিছুক্ষণ বাইরে থাকি, পরে ছাউনিতে বসব।

নৌকা ছেড়ে দেয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে নদীর ও দুই পাড়ের দৃশ্য দেখল। তারপর ছাউনির ভেতরে গিয়ে অঞ্জু বলল, এবার আলাপ শুরু করা যাক কি বলেন?

তানভীর অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। অঞ্জুর কথা শুনে তার দিকে তাকাল।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে অঞ্জু বলল, কিছু বলছেন না যে?

আমি আবার কি বলব? আপনি তো কি আলাপ করবেন বললেন?

প্রথমে কয়েকটা প্রশ্ন করব। আপনাকে প্রমিশ করতে হবে মিথ্যে বলবেন না।

প্রমিশ।

আপনি যে বায়োডাটা দিয়েছেন, তা কতটা সত্য?

বেশির ভাগ মিথ্যে।

মিথ্যে বায়োডাটা দিলেন কেন?

আমি একটু খামখেয়ালি। মাঝে মাঝে যা মনে আসে তাই করি। ঐ দিন সত্য গোপন করে মিথ্যে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই দিয়েছি। অবশ্য দিয়ে ভালই করেছি। নচেৎ এত বেতনের চাকরিটা পেতাম না।

আর আমি যদি বলি, ঐদিন সত্য দিলে আরো বেশি বেতনের সম্মানজনক চাকরি পেতেন।

তা হয়তো পেতাম; কিন্তু ঐ যে বললাম, খামখেয়ালির কথা।

এখন যদি সত্য বায়োডাটা জানতে চাই, বলবেন?

না।

কেন?

বলা যাবে না।

কেন?

সব কেনর উত্তর নেই।

উত্তর নিশ্চয় আছে, আপনি দিতে চাচ্ছেন না।

এই তো ঠিক ধরেছেন। এবার তা হলে এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন।

সে সব প্রশ্নের উত্তরে যদি ঐ একই কথা বলেন?

তা হলে প্রশ্ন করার দরকার নেই।

কিন্তু আমি যে আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাই?

কেন?

অঞ্জু বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে পানি এসে গেছে বুঝতে পেরে দৃষ্টি নত করে সংযত গলায় বলল, কেন বুঝতে পারেন নি?

হ্যাঁ, পেরেছি।

কথাটা শুনে অঞ্জু চমকে উঠল। সেই সাথে আনন্দে চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল। ঐ অবস্থায় তার দিকে তাকিয়ে ভিজে গলায় জিজ্ঞেস করল, বলুন তো কি বুঝতে পেরেছেন?

আপনি আমাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছেন।

আর একবার চমকে উঠে অঞ্জু জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাকে ভালবাসেন নি?

সে কথা বলা যাবে না।

কেন?

কেন উত্তর দেয়া যাবে না।

অঞ্জু চোখ মুঝে বলল, মনে হয় আপনার মাথায় একটু ছিট আছে। তা না হলে একটা কেনরও উত্তর দিচ্ছেন না কেন?

ঠিক বলেছেন। মাও মাঝে মাঝে আমাকে ঐ কথা বলে।

চান্স পেয়ে অঞ্জু জিজ্ঞেস করল, বাবা কিছু বলেন না?

আপনি তো খুব চালাক, মায়ের কথা বলতেই বাবার কথা বলে উনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন জানতে চান।

অঞ্জু বুঝতে পারল, তার থেকে তানভীর বেশি বুদ্ধিমান। বলল, বাবার কথা জানতে চাওয়া কি অন্যায়?

না, অন্যায় নয়; কিন্তু আমি তো বলব না।

অঞ্জু একটু রেগে উঠে বলল, কেন বলবেন না?

যদি বলি আমি জারজ সন্তান, কে বাবা জানি না?

অঞ্জু রেগে উঠে বলল, শিক্ষিত ছেলে হয়ে মিথ্যে করে নিজেকে জারজ বলতে লজ্জা করল না?

আমার লজ্জা নেই।

আবার মিথ্যে বলছেন? দাদির কাছে শুনেছি, যার লজ্জা নেই তার ঈমানও নেই।

তানভীর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো, আপনি কি সত্যিই আমাকে ভালবাসেন?

হ্যাঁ, হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

সত্য বললেন?

কখনও আপনার মতো আমি মিথ্যে বলি না।

তানভীর হেসে ফেলে বলল, আমি তো জানি, যে যাকে সত্যিকার ভালবাসে, তার প্রতি কখনও রাগে না। আমার মনে হয়, আপনি পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাকে ভালবাসেন না। আপনার এক্স স্বামীকেও আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালবাসেন নি। যদি বাসতেন, তা হলে আপনাকে বিয়ে করার চার বছর আগে তিনি বিয়ে করেছেন জেনে তার উপর রাগ করে ডিভোর্স নিতেন না।

অঞ্জু অবাক হয়ে বলল, চাকরি করতে এসে আমার অনেক কিছু জেনেছেন দেখছি।

জানব না কেন? সত্য ঘটনা বাতাস জানিয়ে দেয়।

আপনি কি আমাকে ঘৃণা করেন?

বলা যাবে না। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমি ভালো মন্দ কোনো মানুষকেই ঘৃণা করি না।

আচ্ছা, কি করলে আপনার সঠিক পরিচয় জানতে পারব বলবেন?

ধৈর্য ধরলে।

কতদিন ধৈর্য ধরতে হবে?

তা বলতে পারব না। আর শুধু ধৈর্য ধরলে হবে না, পাশও করতে হবে।

আমার তো মনে হচ্ছে, আপনার অন্তরে দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালবাসা একবিন্দু পরিমাণও নেই।

তা হলে এখন আমার প্রতি ভালবাসা এখন ঘৃণায় পরিণত হল, তাই না?

আপনি খুব গভীর পানির মাছ, ধরা তো দূরের কথা, কাছে পৌঁছানও দুঃসাধ্য।

কথাটা যদি সত্যি বলে থাকেন, তা হলে গভীর পানির দিকে মোটেই এগোবেন না। কারণ ওখানে বড়বড় বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

অঞ্জু মাঝিকে ফিরতে বলে দু'কাপ কফি ঢেলে তানভীরকে এক কাপ দিয়ে নিজেও এক কাপ নিল। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি নিজেকে কি মনে করেন?

একজন নাপাক গুনাহগার আল্লাহর বান্দা।

সব মানুষই আল্লাহর বান্দা। যা জিজ্ঞেস করেছি উত্তর দিন।

তা হলে তো বলতে হয় দোষেগুণে ভূষিত একজন মানুষ।

সব মানুষই দোষগুণে ভূষিত। আমি কি জানতে চেয়েছি তা জানেন, তবু কেন উল্টো পাল্টা বলছেন?

আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন, আমার মাথায় ছিট আছে। যাদের মাথায় ছিট থাকে তারা তো উল্টো পাল্টা বলবেই।

অঞ্জু বুঝতে পারল, তানভীর কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ধৈর্য ধরে ওর আসল পরিচয় জানতে হবে।

তানভীর তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মৃদু হেসে বলল, আপনি ধৈর্য ধরার চিন্তা করছেন? ধৈর্যের ডেফিনেশান জানেন?

অঞ্জু চমকে উঠে ভাবল, আমার মনের কথা ও জানতে পারল কি করে? জিজ্ঞেস করল, আমি যে ধৈর্য ধরার কথা চিন্তা করছি, জানলেন কি করে?

আপনার মুখ দেখে। বলুন না ধৈর্যের ডেফিনেশান জানেন কি না?

ধৈর্যের আবার ডেফিনেশান আছে না কি?

নিশ্চয় আছে।

বলুন তো শুনি।

আপনি জানেন কি না আগে বলুন।

না, জানি না।

ধৈর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ– সহিষ্ণুতা, সহ্য বা অপেক্ষা করার ক্ষমতা। আর ডেফিনেশান হল, হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ ও প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা মন থেকে দূর করে দিয়ে অপেক্ষা করা।

ঘাটে এসে নৌকা থেকে নেমে গাড়িতে উঠে তানভীর বলল, একটা অনুরোধ করব রাখবেন?

অঞ্জু বলল, আপনি আমার একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেন নি। তারপরও ভাবলেন কি করে আমি আপনার অনুরোধ রাখব?

কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্যায় করেছি, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। তবু অনুরোধটা রাখবেন না?

যদি বলি না?

ওটা রাগের কথা, মনের কথা নয়।

কি করে বুঝলেন?

যে ভাবে বুঝলাম আপনি আমাকে ভালবাসেন?

সত্যি, আপনি সাংঘাতিক চালাক ছেলে। বলুন, কি অনুরোধ করবেন।

আগে প্রমিশ করুন রাখবেন?

ঠিক আছে, করলাম।

আমার সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা যতটুকু জেনেছেন, কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। এমন কি আপনার মা, দাদি বা মামার কাছেও না।

গতরাতে তানভীরকে উচ্চশিক্ষিত জানার পর থেকে অঞ্জু তাকে ড্রাইভার রাখা ঠিক হবে না ভেবে মা ও মামার সঙ্গে আলাপ করে বড় কোনো পোস্টে দেয়ার চিন্তা ভাবনা করেছিল। এখন তার অনুরোধ শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ওয়াদা যখন করেছি তখন ভঙ্গ করব না।

তানভীর আলহামদুলিল্লাহ বলে গাড়ি ছেড়ে দিল।

এহতেশাম উদ্দিন সাহেবের সামসদ্দিন নামে এক ভাই ছিল। সে মাস্টার্স পড়ার সময় বন্ধু মাসুমের সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়ি বগুড়া জেলার ধুবচাচিয়া গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিল। একদিন মাসুমের সঙ্গে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ফেরার পথে এক বিয়ে বাড়িতে হৈচৈ শুনে মাসুম বলল, চল তো দেখি কি ব্যাপার।

তারা যখন বিয়ে বাড়িতে এল তখন বর যাত্রীরা বরকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে আর মেয়ের বাবা হাত জোড় করে ছেলের বাবাকে বলছে, বাকি পাঁচ হাজার টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে দেব। আপনি দয়া করে চলে যাবেন না।

ছেলের বাবা তার কথায় কর্ণপাত না করে বর যাত্রীদের নিয়ে চলে গেল।

সামসুদ্দিন মাসুমকে বলল, বরের বাবা মানুষ না, চামার। সামান্য পাঁচ হাজার টাকার জন্য ছেলের বিয়ে না দিয়ে চলে গেল। আর ছেলেটাই বা কি রকম?

মাসুম বলল, তোরা শহরের বড় লোকের ছেলে। তোদের কাছে পাঁচ হাজারের কোনো মূল্য না থাকলেও গ্রামের লোকের কাছে অনেক মূল্য।

সামসুদ্দিন অবাক হয়ে বলল, তুই ঐ চামার লোকটার পক্ষে কথা বলছিস?

তুই আমাকে ভুল বুঝছিস। আমি কারও পক্ষে কথা বলছি না, শুধু টাকার কথা বলেছি। কি জানিস, ঐ ছেলের বাবাকে আর দোষ দেব কি? আজকাল সব ছেলের বাবারাই বিয়ের আগে মেয়ের বাবার কাছ থেকে টাকা নেয়। গরিব হলে পাঁচ-দশ হাজার আর মধ্যবিত্তরা অবস্থা অনুসারে বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ হাজার টাকা নেয়। শুধু তাই নয়, মেয়েকেও সোনার গহনা দিতে হবেই। যে সব মেয়েদের বাবা এসব দিতে পারবে না, তাদের বিয়েই হবে না। তাই বলে মেয়েকে তো আর আইবুড়ো করে চিরকাল ঘরে রাখতে পারে না। তাই যার যা আছে বেঁচে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। যে মেয়ের বিয়ে টাকার জন্য হল না, তাকে ও তার বাবাকে আমি চিনি। মেয়েটার নাম আসমা। খুব সুন্দরী। লেখাপড়ায়ও ভালো। এইট পর্যন্ত পড়ে বাবার আর্থিক অনটনের কারণে আর পড়েনি। ওর বাবা আব্দুর রহিম চাচা খুব ভালো লোক। ওনার কোনো ছেলে নেই, শুধু চার মেয়ে। অবস্থা তেমন ভালো না। তিন মেয়েকে জমি বেঁচে বিয়ে দিয়েছে। আসমা ছোট। আর জমি নেই যে বেঁচে বিয়ে দেবে। গ্রামের মেয়েদের চৌদ্দ-পনের বছরে বিয়ে হয়। আসমার বয়স প্রায় বিশ। তাই হয়তো ধার দেনা করে বিয়ে দিচ্ছিল। বিয়েটা ভেঙ্গে গেল জেনে খুব দুঃখ লাগছে।

সামসুদ্দিন বলল, আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব। তুই মেয়ের বাবাকে বর ও বরযাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে বল। তারপর টাকাটা তার হাতে দিল।

টাকা নিয়ে মাসুম আব্দুর রহিম চাচার কাছে এসে সামসুদ্দিনকে দেখিয়ে বলল, আমার বন্ধু ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছে। পাঁচ হাজার টাকার জন্য বিয়ে ভেঙ্গে গেছে জেনে টাকাটা ও আপনাকে দিচ্ছে। তারপর তার হাতে টাকা দিয়ে বলল, বর ও বরযাত্রীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন।

আব্দুর রহিম চোখ ভরা পানি নিয়ে সামসুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমার ভালো করুক বাবা। এখন আর টাকার দরকার নেই। যে লোক পাঁচ হাজার টাকার জন্য গ্রামশুদ্ধ লোকের কাছে আমাকে অপমান করল, আমার

মেয়েকে দুঃখের সাগরে ভাষাল, সেই লোকের ঘরে আমার মেয়ে দেব না। তাতে যদি আমার মেয়ের সারাজীবন বিয়ে নাও হয় তবু ঐ ছোটলোককে ফিরিয়ে আনতে যাব না। তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও বাবা বলে সামসুদ্দিনকে দিতে গেলেন।

সামসুদ্দিন বলল, টাকা ফেরৎ দিতে হবে না। মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য আপনি হয়তো দেনা করেছেন, এই টাকায় দেনা শোধ করে দেবেন।

আব্দুর রহিম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, তা না হয় দেনা শোধ করব; কিন্তু মেয়েটার কি হবে বাবা? সে তো কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। আর হয়তো তার বিয়েই দিতে পারব না।

সামসুদ্দিন মাসুমের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, চাচাকে বল, আমি তার মেয়েকে বিয়ে করব।

মাসুম জানে সামসুদ্দিন খুব ধার্মিক। গরিবদের দুঃখ দেখলে সহ্য করতে পারে না। নিজের হাত খরচের টাকা দিয়ে তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে। নিজের কাছে না থাকলে মা বাবার কাছ থেকে নেয়। এখন তার কথা শুনে অবাক না হলেও রেগে গেল। বলল, পাগলের মতো কি বলছিস?

আমি যে পাগল নই, তা তুই ভালো করেই জানিস। যা বললাম তাই কর।

কিন্তু তোর বড় ভাইয়ের এখনো বিয়ে হয়নি। সে কি মনে করবে? তা ছাড়া তোর মা বাবা যদি তোদের বিয়ে মেনে না নেন, তা হলে কি হবে ভেবে দেখবি না?

ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। তোকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

তুই কিন্তু বিরাট ভুল করছিস। ঝোঁকের মাথায় পাড়াগাঁয়ের একটা অল্প শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনিস না। যা বলছি শোন, পারলে রহিম চাচাকে আরো কিছু টাকা দিয়ে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে বল।

মেয়ের বাবা বললেন শুনলি না, বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না? তুই আমার জন্য কোনো দুশ্চিন্তা করিস না।

আমি কিন্তু তোর কথা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। হুট করে কোনো কাজ করা উচিত নয়। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে তুই বুঝতে পারবি।

প্যাচাল বন্ধ কর তো। তুই যদি বলতে না চাস, আমি নিজেই মেয়ের মাকে বলব। আমি যা বলি, তা করেই ছাড়ি। বন্ধু হিসাবে কথাটা তুই নিশ্চয় জানিস?

তা জানি। কিন্তু মা জেনে আমাকে খুব রাগারাগি করবে। বলবে, সামসুদ্দিনের মা বাবা তোকে দুষবে। মাসুমের বাবা গত বছর মারা গেছেন। তারপর আরো কিছুক্ষণ দু'জনে তর্ক বিতর্ক করেও যখন মাসুম সামসুদ্দিনকে

নিবৃত্ত করতে পারল না তখন আব্দুর রহিম চাচাকে তার সম্পর্কে সবকিছু জানিয়ে বিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করতে বলল।

কথাটা শুনে গ্রামের দু'চারজন মুরব্বি আব্দুর রহিমকে বিয়ে দিতে নিষেধ করে বললেন, শহরের বড় লোকের ছেলেদের বিশ্বাস নেই। বিয়ের পর ফিরে গিয়ে আর বৌ-এর কথা মনে রাখে না। পরে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তালাক দিয়ে দেয়।

আব্দুর রহিম সামসুদ্দিনকে দেখে ও তার মনের পরিচয় পেয়ে তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো মুরুব্বীদের কথা শুনলে, এ ব্যপারে কিছু বল, সবাই শুনুক।

সামসুদ্দিন বলল, ওরকম ঘটনা মুরুব্বীরা ঘটতে দেখেছেন। তাই বলেছেন। ভালো মন্দ নিয়ে মানুষ আর সব মানুষও সমান নয়। আমি বৌ নিয়েই যাব, এখানে রেখে যাব না।

তার কথা শুনে কেউ কিছু বলল না। রহিম বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, বিয়ে পড়ান হয়ে যাওয়ার পর সামসুদ্দিন মাসুমকে বলল, তোর মা শুনে হয়তো তোকে রাগারাগি করবেন। বন্ধুর জন্য না হয় মায়ের বকুনী সহ্য করবি।

মাসুম বলল, আমি আমার মায়ের বকুনীর কথা ভাবছি না, ভাবছি, বৌ নিয়ে গেলে তোর মা বাবা কি করবেন?

তুই দুশ্চিন্তা করিস না, আমি মা বাবাকে ম্যানেজ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

যদি না পারিস তখন কি করবি?

কি করব তুই দেখতে পাবি।

তুই কি মনে করেছিস আমি তোদের সঙ্গে তোদের বাসায় যাব?

মন চাইলে যাবি, না চাইলে যাবি না। কি হয় না হয় আমিই তোকে জানাব।

তুই কি রাতে এখানেই থাকবি?

হ্যাঁ, থাকব, নচেৎ এরা সবাই মনে কষ্ট পাবে।

খাওয়া দাওয়ার পর মাসুম ঘরে চলে গেল।

আসমা পাড়াগাঁয়ের এইট পাশ মেয়ে হলেও বেশ চালাক চতুর। তার উপর সমবয়সী যেসব মেয়েদের আগে বিয়ে হয়েছে, তাদের কাছ থেকে দাম্পত্য জীবনের অনেক কথা জেনেছে।

তা ছাড়া আব্দুর রহিম এক সময় মেয়েকে জামাই-এর সবকিছু জানিয়ে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রাত এগারটার সময় সামসুদ্দিনকে আসমার এক চাচাতো ভাবি বাসর ঘরে দিয়ে চলে গেল।

সামসুদ্দিন দরজা লাগিয়ে সব জানালা বন্ধ দেখে চৌকির কাছে এসে দাঁড়াল।

চৌকির উপর আসমা ঘোমটা দিয়ে বসেছিল। নেমে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল।

সামসুদ্দিন তাকে দাঁড় করিয়ে ঘোমটা খুলে অবাক। বন্ধু মাসুমের কাছে শুনেছিল, আসমা দেখতে সুন্দরী। কিন্তু তার মনে হল, এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখে নি। সুবহানআল্লাহ বলে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আসমা লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বলল, এতক্ষণ ধরে কি দেখছেন? বসবেন না?

সামসুদ্দিন তার চিবুক ধরে তুলে বলল, আল্লাহর কাছে লাখলাখ শুকরিয়া জানাই, যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক সেরকমই তিনি মিলিয়ে দিলেন।

তার কথা শুনে আনন্দে আসমার চোখে পানি এসে গেল। চোখ মুছে বলল, আপনি কি পাড়াগাঁয়ের অল্পশিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

না, তা চাইনি। তবে জীবনসঙ্গীনি হিসাবে যে মেয়েকে কল্পনা করেছিলাম, তুমি তারই প্রতিচ্ছবি। তুমি অল্প শিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও ইনশাআল্লাহ তোমাকে আমি শহরের শিক্ষিত মেয়ে করে গড়ে নেব। তারপর নিজে বসে তাকেও পাশে বসিয়ে বলল, আমার সব কিছু তুমি কতটা জেনেছ জানি না, শুধু একটা কথা বলব, "সারাজীবন তোমাকে আমি সহধর্মিনী হিসাবে পেতে চাই।" মানুষ সুখের জীবন চায়, দুঃখের জীবন কেউ চায় না। কিন্তু এটা সবারই মনে রাখা উচিত, সুখ ও দুঃখ নিয়েই জীবন। স্ত্রীরা শুধু সুখের জীবন চায়, দুঃখের সময় স্বামীর সঙ্গে কলহ করে। তাদের অনেকে দুঃখের জীবন সহ্য করতে না পেরে চরিত্র হারায় অথবা তালাক নিয়ে সুখের সন্ধান করে। আর সহধর্মিনীরা জানে সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবন। তাই তারা দুঃখের সময় সবর করে আল্লাহর কাছে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা চায়। তারা কোনো কারণেই কখনও স্বামীর সঙ্গে কলহ করে না অথবা তালাকও চায় না। তুমি হয়তো ভাবছ, শহরের ধনীলোকের ছেলেকে স্বামী হিসাবে পেয়ে খুব সুখে থাকবে? অবশ্য ভাবাটাই স্বাভাবিক এবং ভাগ্যে থাকলে তোমার আশা পূরণও হবে। কিন্তু ভাগ্যে যদি না থাকে তখন দুঃখের জীবন কাটাতে হবে। তাই জীবন যাত্রার প্রথম রাতেই তোমার জানা দরকার ভেবে বললাম। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, আমার কথা বুঝতে পেরেছ তো?

আসমা বলল, জি পেরেছি।

তা হলে বল, স্ত্রী না সহধর্মিনী হতে চাও।

সহধর্মিনী। তারপর বসে দু'পা জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, আমি পাড়াগাঁয়ের অল্পশিক্ষিত মেয়ে হয়ে যতটুকু শিক্ষা পেয়েছি তা দিয়ে আপনার মনের মতো সহধর্মিনী হওয়ার চেষ্টা করব। যদি ভুল-ত্রুটি হয় ক্ষমা করে দিয়ে আপনার উপযুক্ত করে নেবেন।

আলহামদুলিল্লাহ বলে সামসুদ্দিন তাকে বুকে জড়িয়ে তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, খুব দামী কথা বলেছ। মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি করে। আমিও হয়তো করে ফেলব। তখন তুমিও আমাকে ক্ষমা করে শুধরে দিও। তাই ইসলাম বলেছে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকবে। আর সাংসারিক জীবনে সুখ শান্তি পেতে হলে উভয়ে একে অন্যকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবে। তোমার কথায় আমি খুব খুশী হয়েছি। দো'য়া করি, "আল্লাহ যেন আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখের ও শান্তির করেন। দুঃখের সময় তিনি যেন আমাদেরকে সবর করার তওফিক দেন।"

আসমা আমিন বলে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বলল, অনেক রাত হয়েছে এবার ঘুমাও।

সামসুদ্দিন তাকে আবার জড়িয়ে ধরে বলল, এই শুভরাত্রে কেউ কোনোদিন ঘুমিয়েছে? না ঘুমাতে পেরেছে? তারপর তাকে বিছানায় তুলে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠল।

তিনদিন পরে সামসুদ্দিন আসমাকে নিয়ে ঢাকা রওয়ানা দিল। আত্মীয়দের কথামতো জামাই-এর ঠিকানা ও তার মা বাবা মেয়েকে কিভাবে গ্রহণ করে জানার জন্য আব্দুর রহিম তাদের সঙ্গে এসেছেন। বন্ধু মাসুম সঙ্গে এলেও সামসুদ্দিনকে বলে দিল, আমি তোদের বাসায় যাব না।

আসমা ও শ্বশুরকে নিয়ে সামসুদ্দিন যখন ঢাকায় পৌছাল তখন বিকেল পাঁচটা।

তার বাবা ইকবাল সাহেব বারান্দায় চা খেতে খেতে স্ত্রীর সঙ্গে সামসুদ্দিন কবে ফিরবে সে ব্যাপারে আলাপ করছিলেন। বড় ছেলে এহতেশাম উদ্দিন চা খেয়ে একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

সামসুদ্দিন স্ত্রী ও শ্বশুরকে নিয়ে সেখানে এসে সালাম দিয়ে মা-বাবাকে কদমবুসি করল।

ছেলের সঙ্গে ওদেরকে দেখে অবাক হলেও সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, এক্ষুনি তোর কথা বলছিলাম। তা ওরা কে?

আমি বিয়ে করেছি বাবা, তারপর আসমাকে দেখিয়ে বলল, ও তোমাদের বৌমা আর উনি আমার শ্বশুর। কথা শেষ করে মা বাবাকে কদমবুসি করার জন্য সামসুদ্দিন স্ত্রীকে ঈশারা করল।

আসমা শ্বশুরকে কদমবুসি করতে গেলে ইকবাল সাহেব গর্জে উঠলেন, খবরদার, এক পা এগোবে না। তারপর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বিয়ে কি পুতুল খেলা নাকি? বললেই হল বিয়ে করেছি? আমি এ বিয়ে মানি না। তারপর আব্দুর রহিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ছেলেকে সহজ সরল পেয়ে মেয়েকে তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন? ছেলের খোঁজ খবর না নিয়ে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেন? মনে করেছেন, বড় লোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে আর্থিক সাহায্য পাবেন। পাড়াগাঁয়ের লোক যে এত লোভী জানতাম না। যান, এই মুহূর্তে মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যান। নচেৎ পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।

বাবা, তুমি শুধু শুধু ওনাকে ও গ্রামের লোকজনদের দোষ দিচ্ছ। ওনাদের কোনো দোষ নেই। ওনারা বিয়ে দিতে চান নি; আমি জোর করে করেছি।

ইকবাল সাহেব আবার গর্জে উঠলেন, তুই চুপ কর। শুধু শুধু তুই জোর করে বিয়ে করতে যাবি কেন? বড় লোকের ছেলে জেনে টাকার লোভে নিশ্চয় ওরা তোকে ফাঁদে ফেলেছে? তুই ভিতরে যা, এদেরকে কি করে বিদেয় করতে হয় আমার জানা আছে।

বাবা, তুমি ভুল করছ। ওনারা টাকার লোভে আমাকে ফাঁদে ফেলেন নি। তারপর মাকে বলল, তুমি কিছু বলছ না কেন?

স্ত্রী কিছু বলার আগে ইকবাল সাহেব রাগের সঙ্গে বললেন, তোর মা আবার কি বলবে? যা, ভিতরে যা বলছি।

সামসুদ্দিন দৃঢ়স্বরে বলল, না, যাব না। ভিতরে গেলে ওদেরকে নিয়েই যাব।

আর আমি যদি ওদেরকে দারোয়ান দিয়ে বের করে দিই?

তা হলে আমিও ওদের সঙ্গে চলে যাব।

ইকবাল সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ধার্মিক ছেলের কথা শুনেছ? তারপর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভালো চাস তো ভিতরে যা, নচেৎ.... রাগের চোটে কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

নচেৎ কি করবেন?

তোকেও ওদের সঙ্গে বের করে দেব।

তার আগেই আমি ওদেরকে নিয়ে চলে যাচ্ছি বলে সামসুদ্দিন স্ত্রী ও শ্বশুরকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

ইকবাল সাহেব বললেন, যাচ্ছিস ,যা তবে জেনে রাখ, চিরকালের জন্য তোর জন্য এ বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

জমিলা বেগম এতক্ষণ ছেলে ও স্বামীর কথা কাটাকাটি শুনছিলেন। সামসুদ্দিন হঠাৎ করে পাড়াগাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসবে তিনি ভাবতেই পারেননি না। তারপর বাপ বেটার কথার মধ্যে কিছু বলার চান্স পাচ্ছিলেন না। ছেলেকে বৌ ও শ্বশুরের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখে স্বামীকে বললেন, ওদেরকে ফিরিয়ে আন।

ইকবাল সাহেব বললেন, না ফেরাব না। তুমি ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছ। তা না হলে এরকম কাজ করতে পারত না। আমাদের একটা স্ট্যাটাস আছে, সেদিকে খেয়াল করবে না।

দেখ, মাথা গরম করে কোনো কাজ করতে নেই। সেই কাজের ফলও ভালো হয় না। যা করার ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে করতে হয়। তোমার উচিত ছিল ছেলের সব কথা শোনা। তা না করে.....

স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে ইকবাল সাহেব কড়া মেজাজে বললেন, ছেলের কথা আবার কি শুনব? ওতো দয়ার সাগর। মেয়েটার বাবা গরিব বলে হয়তো বিয়ে দিতে পারে নি। তোমার ছেলে সে কথা জেনে বিয়ে করে মেয়ের বাবার উপকার করেছে। কথাটা যদি সত্য হয়, তা হলে তুমিই বল, শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে বাবাদের আর্থিক দুরাবস্তার কারণে লক্ষ কোটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, তাদের কি হবে?

তাদের কি হবে সেকথা আল্লাহ ভালো জানেন। তবে বিত্তবানদের উচিত বিনা পনে তাদেরকে ছেলের বৌ করে ঘরে তোলা। সেটা সম্ভব না হলে টাকা পয়সা সাহায্য করে তাদের বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। তুমি ছেলে বৌকে এভাবে তাড়িয়ে দেবে ভাবতেই পারছি না। এখন ওরা কোথায় থাকবে, কি করবে চিন্তা করলে না? সামসুদ্দিনের কাছে যদি টাকা পয়সা না থাকে, তা হলে কি পরিস্থিতে পড়বে বাবা হয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল।

কি উচিত ছিল না ছিল, সেকথা তোমার কাছে জানতে হবে না কি? বাবা হয়ে যা করা উচিত, তাই করেছি। ছেলে মা বাবার তোয়াক্কা না করে হুট করে যেন তেন মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসবে আর আমরা ঢাকঢোল বাজিয়ে সেই বৌ ঘরে তুলবো ভাবলে কি করে?

আমি ঢাকঢোল বাজিয়ে বৌকে ঘরে তোলার কথা বলিনি। বলেছি ছেলে-বৌকে ফিরিয়ে আনতে। তুমি যদি না আন, তা হলে আমি আনব।

এমন সময় এহতেশাম উদ্দিন বাসায় ফিরে মায়ের কথা শুনে বলল, কাদেরকে ফিরিয়ে আনার কথা বলছ মা?

জমিলা বেগম সামসুদ্দিনের বিয়ে করার ও বৌ ও শ্বশুরকে নিয়ে আসার কথা বলে বললেন, তোর বাবা তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজটা কি ভালো করেছে? এখন ও বৌ শ্বশুরকে নিয়ে কোথায় থাকবে? কি খাবে তুই-ই বল?

সামসুদ্দিন এভাবে বিয়ে করে বৌ নিয়ে আসবে এহতেশাম উদ্দিনও ভাবতেই পারে নি। মাকে জিজ্ঞেস করল, ওরা কতক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে?

জমিলা বেগম বললেন, এইতো একটু আগে।

আমি ওদের নিয়ে আসি বলে এহতেশাম উদ্দিন যেতে উদ্যত হলে ইকবাল সাহেব গর্জে উঠলেন, খবরদার, তুই ওদের ফিরিয়ে আনতে যাবি না।

এহতেশাম উদ্দিন কাতরস্বরে বলল, তুমি নিষেধ করো না বাবা, যত বড়ই অন্যায় করুক সামসুদ্দিন তোমারই ছেলে, তাকে ক্ষমা করে দাও।

না, ওকে আমি কোনোদিন ক্ষমা করব না।

ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি বাবা, ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

ভাই হিসাবে ওকে তুই যতটা ভালবাসিস, ছেলে হিসাবে তাকে আমি তার থেকে অনেক বেশি ভালবাসি। তবু আমি ওকে ক্ষমা করব না। জানব, তুই আমার একমাত্র ছেলে।

না বাবা না, তা হয় না। ওদেরকে ফিরিয়ে আনতে আমাকে নিষেধ করো না।

জমিলা বেগম বললেন, আমি বলছি তুই যা।

হ্যাঁ মা যাচ্ছি, বাবার নিষেধ শুনব না। এই কথা বলে এহতেশাম উদ্দিন কয়েক পা গেলে ইকবাল সাহেব উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ওদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছিস যা, কিন্তু তোর জন্যও এবাড়ির দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

এহতেশাম উদ্দিন দাঁড়িয়ে পড়ে কান্নাজড়িত স্বরে বলল, কাজটা তুমি ভালো করলে না বাবা। তারপর চোখ মুছতে মুছতে নিজের রুমে চলে গেল।

বড় ছেলের কান্না দেখে জমিলা বেগমেরও চোখে পানি চলে এল। কান্নাভেজা কণ্ঠে স্বামীকে বললেন, তোমার মতো কঠিন মনের মানুষ জীবনে দেখিনি। তারপর চোখ মুছতে মুছতে সেখান থেকে চলে যেতে যেতে বললেন, এ ছেলের জন্য তোমাকে একদিন পশতাতে হবে।

সামসুদ্দিন বৌ ও শ্বশুরকে নিয়ে একটা হোটেলে উঠল। ঘটনা দেখে আব্দুর রহিম যেন বোবা হয়ে গেছেন। কোনো বাবা তার ছেলে-বৌকে এভাবে বের করে দেবে ভাবতেই পারছেন না।

আসমার অবস্থা ও বাবার মতো। তাকে বিয়ে করার ফলে তার স্বামী এরকম অবস্থা পড়বে কল্পনাও করেনি। শহরের বড়লোকদের মন এত শক্ত ভাবতেই পারে নি। তারই জন্য এরকম হল ভেবে সেই থেকে চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে।

হোটেলে উঠে খাওয়া-দাওয়ার পর সামসুদ্দিন শ্বশুরকে বলল, বাবা এরকম করবেন চিন্তাই করিনি। যাক, যা ভাগ্যে আছে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। কয়েকদিন হোটেলেই আমাদেরকে থাকতে হবে। এর মধ্যে দেখি আল্লাহর কি ইচ্ছা।

সামসুদ্দিন বাথরুমসহ একটা ডবল ও একটা সিঙ্গেল সীটের রুম ভাড়া নিল। শ্বশুরকে সিঙ্গেল রুমে নিয়ে এসে সবকিছু দেখিয়ে বলল, কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। আমি বেঁচে থাকতে আপনার মেয়ে এতটুকু কষ্ট পাবে না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান। কথা শেষ করে ফিরে এসে দেখল, আসমা খাটে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার পাশে বসে চোখ মুছে দিয়ে বলল, কাঁদছ কেন? তোমাকে বাসর রাতে কি কথা বলেছিলাম মনে নেই?

আসমা তাকে জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় বলল, হ্যাঁ, মনে আছে, সবর করার কথা বলেছিলে। কিন্তু আমার জন্য তোমাকে এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হল ভেবে শুধু কান্না পাচ্ছে।

অন্তত আমার অবস্থার কথা চিন্তা করে আল্লাহর কাছে সবর করার ক্ষমতা চাও। তারপর তাকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলল।

তিন চার দিনের মধ্যে বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে আসমার সামনে শ্বশুরকে টাকাগুলো দিয়ে বলল, কাল আমরা ধুবচাচিয়া ফিরে যাব। তারপর আমি ঢাকায় ফিরে এসে চাকরির চেষ্টা করব। চাকরি পাওয়ার পর বাসা ভাড়া নিয়ে আসমাকে নিয়ে আসব।

জামাই-এর এই পরিস্থিতির জন্য আব্দুর রহিম নিজেকে অপরাধী ভাবছেন। জামাই-এর কথা শুনে চোখে পানি এসে গেল। চোখ মুছে বললেন, আমি আর কি বলব বাবা, এটাই হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা।

হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথা বলেছেন। আপনি দো'য়া করুন, আল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি রোজগার করার ব্যবস্থা করে দেন।

আব্দুর রহিম কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

সামসুদ্দিন পরের দিন তাদেরকে নিয়ে ধুবচাচিয়া এল। তাদেরকে পৌঁছে দিয়ে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কথা শ্বশুরকে বললেও ফিরে যেতে ইচ্ছা করল না। সে কথা একদিন শ্বশুরকে জানিয়ে বলল, আমি এখানে কিছু করে থেকে যেতে চাই।

আব্দুল রহিম বললেন, তুমি শহরের বড় লোকের ছেলে, এখানে খুব কষ্ট হবে। তা ছাড়া গ্রামের লোকজন নানান কথা বলবে। সেসব শুনে আরো বেশি কষ্ট পাবে। তার চেয়ে ঢাকায় গিয়ে চাকরির চেষ্টা কর।

আপনি ভালো কথা বলেছেন। কিন্তু আমি আপনার কথা রাখতে পারব না। আমাকে মাফ করবেন। এখানে আমার যত কষ্টই হোক, ইনশাআল্লাহ আমি সহ্য করতে পারব।

কিন্তু বাবা, আমাদের সব দিন চুলোয় হাঁড়ি চড়ে না, তুমি জামাই, তোমার মর্যাদা আমরা রাখতে পারব না।

ওসব নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। যে দিন চুলোয় হাঁড়ি চড়বে না, সেদিন যদি আপনারা না খেয়ে থাকতে পারেন, আমি পারব না কেন? শ্বশুরবাড়িতে থাকা যে জামাই-এর অমর্যাদা। তা আমি জানি। তবু আমি ঢাকায় না গিয়ে এখানেই কিছু রোজগার করার চেষ্টা করব।

আব্দুর রহিম বুঝতে পারলেন। জামাই খুব এক রোখা। তাই বললেন, আমার যা বলার বলেছি। শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছা। তবে তোমার উপর জোর খাটাব না।

সামসুদ্দিন মাস ছ'য়েক হাই স্কুলের কয়েকটা ছাত্রকে পড়িয়ে বেশ সুনাম অর্জন করল। বেসকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। তারপর তার বায়োডাটা নিয়ে তার সবকিছু জেনে ইংরেজি শিক্ষকের পদে নিয়োগ করলেন।

তারপর থেকে সামসুদ্দিনের কোনো অসুবিধা রইল না। শুধু তাই নয়, ভালো শিক্ষক হিসাবে যেমন সুনাম ছড়িয়ে পড়ল তেমনি আব্দুর রহিমকেও গ্রামের লোকজন আর আগের মতো দেখে না। এখন সম্মানের চোখে দেখে। আর

আসমার সমবয়সীরা যাদের আগে বিয়ে হয়েছিল, তাদের কেউ কেউ খুশী হলেও অনেকে হিংসে করে।

বছর দু'য়েকের মধ্যে সামসুদ্দিন শ্বশুরের ভিটেয় দু'কামরা পাকাঘর করে আলাদা সংসার করলেও শ্বশুর শাশুড়ীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। তাদের যেন এতটুকু কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে আসমাকে বলে দিয়েছে।

বিয়ের তিন বছর পর আসমা একটা ছেলে প্রসব করল। সামসুদ্দিন সাতদিনে দুটো খাসি জবেহ করে নাম রাখল তানভীর আহম্মদ।

তানভীর যে বছর কুষ্টিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক ইতিহাসে মাস্টার্স পাশ করে। সে বছর সামসুদ্দিন মারা গেল।

সামসুদ্দিন যেমন ছেলেকে নিজের কথা কিছু জানাইনি, তেমনি স্ত্রীকেও জানাতে নিষেধ করেছিল। তাই বাবার সম্পর্কে তানভীর কিছুই জানে না।

বাবার মৃত্যুর পর একদিন তার বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ডায়েরি পেল। সেটা পড়ে বাবার সবকিছু জেনে ভীষণ অবাক হল। সেই সাথে মা-বাবার প্রতি বাবার অভিমান ও একরোখা স্বভাবের কথা জানতে পারল। আরো জানতে পারল, বাবা শহরের কোটিপতির ছেলে হয়েও এই পাড়াগাঁয়ে প্রথম দিকে কত কষ্ট সহ্য করেছে। এক সময় তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। চোখ মুছে দো'য়া করল, "আল্লাহ তুমি আমার বাবার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে জান্নাত বাসী করো।" তারপর মায়ের কাছে গিয়ে তার হাতে ডাইরীটা দিয়ে ছলছল চোখে বলল, বাবা না হয় তার আসল পরিচয় জানায় নি, তাই বলে তুমিও এতদিন জানাও নি কেন?

প্রতিদিন রাতে ঘুমাবার আগে স্বামী ডাইরীতে কি লিখত আসমা জানতো। তাই একদিন তাকে বলেছিল, ছেলে বড় হয়েছে, তাকে তোমার সবকিছু জানান উচিত।

সামসুদ্দিন বলেছিল, আমি নয়। আমি মারা যাওয়ার পর ডাইরীটা তার হাতে দিয়ে তুমি বলবে, সে যেন কখনও সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দাদা-দাদি বা চাচা-চাচির কাছে কখনও না যায়।

এখন ছেলের কথা শুনে ডাইরীটা ফেরৎ দিয়ে বলল, আমার মন-মানসিকতার কারণে ডাইরীর কথা মনে ছিল না। নচেৎ দু'একদিনের মধ্যে আমিই তোকে দিতাম। তারপর তার বাবার পরিচয় না জানানর কারণ ও স্বামী যা বলতে বলেছিল বলল।

তুমি না বললেও আমি কখনও দাদা-দাদি বা চাচা-চাচির কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতাম না।

সামসুদ্দিন মারা যাওয়ার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারি তানভীরকে তার বাবার পোস্টে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সে রাজি হয় নি। কারণ ডাইরিটা পড়ার পর দাদা-দাদি ও চাচা-চাচিকে দেখার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই মাস্টারির চাকরি না করে ঢাকায় কিছু করার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিল। একদিন সে কথা মাকে জানাল।

আসমা বলল, আমার ইচ্ছা এখানের মাস্টারির চাকরি করার।

মাস্টরি করে জীবনে কেউ উন্নতি করতে পেরেছে? তা ছাড়া আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঢাকাতে চাকরি করার সাথে সাথে মুসলমানদের অবনতি ও তার প্রতিকারের উপর একটা থিসিস লিখব। এখানে মাস্টারি করে সংসারের ঘানি টানব না থিসিস লিখব?

আসমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই তোর বাবার মতো একরোখা হয়েছিস। আমার কথায় তোর সিদ্ধান্ত বদলাবে না জানি। তবু মা হয়ে যা বলা উচিত বললাম।

তানভীর মায়ের দু'পা জড়িয়ে ধরে বলল, কিন্তু তুমি খুশী মনে অনুমতি না দিলে আমি তো সাকসেসফুল হতে পারব না। তা ছাড়া তোমার দো'য়া আমার একমাত্র পাথেয়।

ছেলের মাথায় চুমো খেয়ে পাশে বসিয়ে আসমা বলল, তুই আমার একমাত্র সন্তান। তোর জন্য দো'য়া করব না তো কার জন্য করব। আমি খুশী মনে অনুমতি দিলাম। তবে তোকে ওয়াদা করতে হবে, তোর দাদা-দাদি ও চাচা-চাচির সঙ্গে কোনো রকমের যোগাযোগ করবি না। তোর দাদা মারা যাওয়ার পর তোর চাচা সে কথা জানিয়ে তোর বাবাকে বৌ-ছেলে নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য কাগজে বিজ্ঞপ্তী দিয়েছিল। বিজ্ঞপ্তী পড়ে আমি তাকে অনেক করে বলেছিলাম, আমার জন্য তুমি কত কষ্ট সহ্য করে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছ, চল না ফিরে যাই। তোর বাবা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, তা হয় না। আমি আর কোনোদিন ফিরে যাব না। আর তোকেও যেতে নিষেধ করার কথা আমাকে বলেছিল।"

ঠিক আছে মা, ওয়াদা করলাম বাবার কথা রাখব।

মাসখানেক পর তানভীর ঢাকায় এল। আসার সময় দূর সম্পর্কের এক দুলাভাইয়ের ঠিকানা এনেছিল। তার বাসায় উঠল। তারপর মাস খানেক চাকরির চেষ্টা করে বিফল হয়ে ঐ দুলাভাইয়ের কথামতো ড্রাইভিং শিখে এবং তিনিই এক সাহেবের ড্রাইভারের চাকরি পাইয়ে দেন।

মায়ের কাছে ওয়াদা করলেও ঢাকায় আসার সময় ডায়েরিটা সঙ্গে নিয়েছিল; কিন্তু পথে হারিয়ে যায়।

চাকরি পাওয়ার পর থিসিস লিখতে শুরু করল। কিন্তু সময়ের অভাবে তেমন অগ্রসর হতে পারল না। তবু যতটুকু সম্ভব লিখতে লাগল।

অঞ্জুর কাছে চাকরি নেয়ায় প্রচুর সময় পায়। অঞ্জু অফিস থেকে বাসায় আসার পর কোথাও যায় না। তানভীর বাকি সময়টা থিসিস লেখার কাজে ব্যয় করে।

অঞ্জুর দাদি জমিলা বেগমের তানভীরকে দেখে যে কথা মনে হয়েছে, তা স্বামীর নিষেধের কথা মনে করে কাউকে জানালেন না। এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিলেন, একই রকম মানুষ অনেক সময় দেখা যায়। প্রবোধ দিলেও মন মানে না। তাই সময় সুযোগ মতো চুপি চুপি তানভীরের কাছে এসে গল্প করে। এক সময় দাদি-নাতির সম্পর্কও করে ফেলেন। একদিন কথায় কথায় অঞ্জুর বিয়ে ও ডিভোর্সের কথাও বলে ফেলেন।

তানভীর একটা ব্যাপারে খুব অবাক হল। জমিলা বেগম কখনও তার সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে চান নি। ব্যাপারটা নিয়ে মাঝে মাঝে চিন্তাও করে। একদিন থাকতে না পেরে সরাসরি জিজ্ঞেস না করে বলল, আপনি কোটি পতির স্ত্রী ছিলেন, এখন কোটিপতির দাদি, কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় দুঃখী। আপনার মনে কি এমন দুঃখ?

এই কথা শুনে জমিলা বেগমের চোখে পানি এসে গেল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললেন, এটা তোমার চোখের ভুল। আমার মতো সুখী আর কেউ আছে কিনা জানি না।

আপনার চোখের পানি কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি। যতই সুখী বলেন না কেন, আমার ধারণা জীবনে এমন কোনো দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল যা আজও ভুলতে পারেন নি।

জমিলা বেগম আবার চোখ মুছে বললেন, সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। তবে যাই ঘটুক না কেন, দাম্পত্য জীবনে আমি খুব সুখী ছিলাম।

শুনেছি দুঃখের ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ করলে দুঃখটা হালকা হয়। আপনি ঘটনাটা বলুন, দেখবেন মন অনেকটা হালকা হয়ে গেছে।

তোমার কথা ঠিক; ঘটনাটা প্রকাশ করলে মনটা হালকা হত। কিন্তু সে কথা কারো কাছে বলা যাবে না।

কেন বলুন তো?

তাও বলা যাবে না বলে আবার চোখ মুছলেন।

আচ্ছা দাদি, আমার কথা জানতে ইচ্ছা করে না।

করে?

তা হলে এতদিন জানতে চান না কেন?

ভয়ে!

তানভীর খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, এতে ভয় পাওয়ার কি আছে?

আছে বলেই তো ভয় পাই।

আমি যদি অভয় দিই?

কান্নাভেজা মুখে হাসি ফুটিয়ে জমিলা বেগম বললেন, না ভাই, ওসব কিছু নয়। তোমার পরিচয় পেয়ে ভয় পাওয়ার কি আছে? তুমি অল্প শিক্ষিত ড্রাইভার। তোমার পরিচয় জেনে কোনো লাভ নেই ভেবে জানতে চাইনি।

তানভীর বুঝতে পারল, প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য দাদি কথাটা বললেন। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, আমাকে যদি তাই মনে করেন, তা হলে সবার অলক্ষে গোপনে আমার কাছে আসেন কেন?

কেন আসি, আমি ও আল্লাহপাক জানেন। তুমি যদি বিরক্ত হও, তা হলে আর আসব না বলে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

জমিলা বেগম খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পেরে তানভীর তাড়াতাড়ি হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, আমি অল্পশিক্ষিত ড্রাইভার হয়ে কথাটা বলা আমার খুব অন্যায় হয়েছে, মাফ করে দিন। আর কখনও এরকম কথা বলব না। আমার দাদি থেকেও নেই। আপনি আমাকে দাদি বলার অনুমতি দিয়েছেন। তা যে আমার কত সৌভাগ্য তা আল্লাহপাক জানেন। বলুন মাফ করে দিয়েছেন?

আল্লাহ সবাইকে মাফ করুক বলে জমিলা বেগম বললেন, অনেকক্ষণ এসেছি, এবার যাই। কথা শেষ করে চলে গেলেন।

একদিন অঞ্জুর কেন কি জানি রাত একটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরে যখন আর কিছুতেই চোখে ঘুম এল না তখন হঠাৎ তানভীরের কথা মনে পড়ল।

ভাবল, তার কি আজও থিসিস লেখা শেষ হয়নি? ভাবল, তানভীর সেদিন নিজেকে জারজ সন্তান বলল কেন? কথাটা কি সত্য? না পরিচয় গোপন করার জন্য মিথ্যে বলল? এখন গিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? আবার ভাবল, সে যদি ঘুমিয়ে থাকে? তার মন বলে উঠল, ঘুমিয়ে থাকলে ফিরে আসবি। কাল ঘুমাবার আগে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি। এতরাতে যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে ঘুমাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই ঘুমাতে পারল না। চোখ বন্ধ করলেই তানভীরের ছবি ভেসে উঠে।

শেষে খাট থেকে নেমে নিচে এসে ভেন্টিলেটারে আলো দেখে বুঝতে পারল, জেগে আছে। সেদিনের মতো আজও দরজায় আঙ্গুল দিয়ে কয়েকটা টোকা দিল।

তানভীর লিখছিল। দরজার টোকা শুনে ভাবল, আজও কি অঞ্জু এসেছে? কিছুক্ষণ পর আবার টোকা শুনে দরজা খুলে দিল।

অঞ্জু ভিতরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে একবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখনও থিসিসটা শেষ হয়নি?

তানভীর বলল, হ্যাঁ, হয়েছে। গত সপ্তাহে আমেরিকার ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে পাঠিয়ে দিয়েছি।

তাই নাকি? শুনে খুশী হলাম। তারপর এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে বলল, এবার তা হলে সত্য পরিচয় জানাতে আপত্তি নেই?

পরিচয় জানার জন্য এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন?

এক বছর পার হয়ে গেল, তবু তাড়াহুড়ো বলছেন?

তা বলছি না, থিসিসটার রেজাল্ট পাওয়ার পর জানাব ভেবেছিলাম।

অঞ্জু একটু গম্ভীরস্বরে বলল, না, আজ এক্ষুনি বলতে হবে।

মনে হচ্ছে, কোনো ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তিত আছেন?

কি করে বুঝলেন?

আপনার চেহারা দেখে।

অঞ্জু হেসে ফেলে বলল, ঠিক বলেছেন। একটা ব্যাপারে খুব চিন্তায় আছি।

আপত্তি না থাকলে ব্যাপারটা বলুন, সাধ্যমতো চিন্তাটা দূর করার চেষ্টা করব। তবে এখানে নয়, কাল অফিসে আপনার কথা শুনব।

কেন এখন শুনলে কি হয়?

জেনেও জিজ্ঞেস করছেন কেন? প্লীজ চলে যান, আর কখনও এত রাতে আসবেন না।

আচ্ছা, আপনি পুরুষ হয়ে এত ভীতু কেন বলুন তো? কই, মেয়ে হয়েও আমি তো ভয় পাচ্ছি না।

আপনি কি চান, আমাকে আপনাকে নিয়ে কেউ খারাপ ধারণা করুক?

যে যাই ধারণা করুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তা ছাড়া বাসায় এমন কেউ নেই যে, আমাদের দেখে খারাপ কিছু ভাববে। মা আর দাদির কথা যদি বলেন, তা হলে বলব, তারা দেখলে কিছু মনে করবে না। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন; বসুন। চিন্তার ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করব।

বললাম না, কাল অফিসে আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

অফিসে আলাপ করার সময় কোথায়? এখনই করব, আপনি বসুন।

একটাই চেয়ার। তাই অনিচ্ছা সত্বেও তানভীর খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, বলুন কি আলাপ করতে চান।

তার আগে আপনার পরিচয় জানতে চাই।

তানভীর হেসে ফেলে বলল, কেন অপরিচিতকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালবাসা যায় না?

যদি বলি তাই?

আপনি ভুল করছেন। অপরিচিতকে এক পার্সেন্টও ভালবাসা উচিত নয়।

আমাকে জ্ঞান দান করতে হবে না। যা জানতে চেয়েছি, বলুন।

বলতে পারি দুটো শর্তে।

কি কি শর্ত বলুন।

প্রথম শর্ত হল, প্রমিশ করতে হবে কোনো করণেই আমার পরিচয় অন্য কাউকে বলতে পারবেন না।

ঠিক আছে, প্রমিশ করলাম। এবার দ্বিতীয় শর্তটা বলুন।

আমাকে যতটুকু ভালবেসেছেন তা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত শুনে অঞ্জু অপমান বোধ করে এত রেগে গেল যে, বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

তার অবস্থা বুঝতে পেরেও তানভীর না বোঝার ভান করে বলল, চুপ করে আছেন কেন? আপনি তো প্রথম স্বামীর কারণে পুরুষদের ঘৃণা করেন। আমাকে তো আপনার ঘৃণা করাই উচিত। তা হলে প্রমিশ করতে বাধা কোথায়?

অঞ্জু কোনো কথা না বলে খুব রাগের সঙ্গে বড় বড় চোখ বের করে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে তানভীর আবার বলল, আপনি শিক্ষিতা, এক বছর স্বামীর ঘর করেছেন, তা ছাড়া একটা অফিসও চালাচ্ছেন। এত রেগে

যাওয়া উচিত হয় নি। জানেন না, মানুষ বেশি রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে? অনেকে রাগের মাথায় এমন কাজ করে ফেলে, রাগ পড়ে গেলে সে জন্য অনুশোচনা করতে হয়। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আপনার ভালোর জন্য শর্ত দুটো বলেছি। প্লীজ, আমাকে ভুল বুঝবেন না।

তানভীরের কথায় অঞ্জুর রাগ পড়ে গেল। সংযত স্বরে বলল, সেদিন বলেছিলেন, আপনি ভালো মন্দ কাউকেই ঘৃণা করেন না। এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার একবার বিয়ে হয়েছিল বলে আমাকে ঘৃণা করেন। তা না হলে বার বার প্রথম স্বামীর কথা উল্লেখ করে কথা বলতেন না।

আপনার ধারণা ভুল। আমি কখনও মিথ্যা বলি না। আমার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মাবার জন্য প্রথম স্বামীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি।

আমি আপনার দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারেও প্রমিশ করলাম। এবার আপনাকেও একটা ব্যাপারে প্রমিশ করতে হবে।

বলুন।

আমাকে বিয়ে করতে হবে।

অঞ্জু যে একদিন একথা বলবে, তানভীর অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল। তাই হেসে উঠে বলল, এক্ষুনি বললাম না, "রাগের মাথায় অনেকে এমন কাজ করে ফেলে, রাগ পড়ে যাওয়ার পর সেজন্য অনুশোচনা করতে হয়।"

আমি রাগের মাথায় বলিনি। ঠান্ডা মাথায় বলেছি। অন্য প্রসঙ্গে না গিয়ে বিয়ে করবেন কিনা বলুন।

আমার তো মনে হচ্ছে, আমার থেকে আপনার মাথায় বেশি ছিট আছে। তা না হলে যাকে ভালবাসার বদলে ঘৃণা করার প্রমিশ করলেন, তাকেই আবার বিয়ে করতে চাচ্ছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ভালবাসার জায়গায় যদি ঘৃণা থাকে, তা হলে তো দুনিয়াতেই দোযখের শাস্তি দু'জনকেই ভোগ করতে হবে।

আজ থেকে বিয়ের আগ পর্যন্ত আপনাকে একটুও ভালবাসব না, ঘৃণা করব। যতটুকু ভালবেসেছিলাম, ছুঁড়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দেব। বিয়ের পর এমন ভালবাসব ও এমন কাজ করব, যাতে করে দু'জনেই দুনিয়াতে বেহেশতের সুখের নমুনা অনুভব করতে পারি।

অঞ্জুর কথা শুনে তানভীর এত অভিভূত হল যে, কিছু বলতে না পেরে অনেক্ষণ মুখ নিচু করে রইল।

অঞ্জু ভিজে গলায় বলল, আমি তোমার দুটো কঠিন শর্ত মেনে নিলাম, আর তুমি আমার একটা শর্ত মেনে নিতে পারছ না?

তানভীর মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, বিয়ের ব্যাপারে খুব চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমাকে একবছর পরীক্ষা করে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমাকে অন্তত কয়েকটা দিন সময় দিন।

ঠিক আছে, এবার পরিচয় বল।

তানভীর বাড়ির ঠিকানা বলে বলল, বাবা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। প্রায় বছর দু'য়েক আগে মারা গেছেন। আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান। কুষ্টিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক হিস্ট্রিতে মাস্টার্স করেছি। তারপরের ঘটনা তো আপনি জানেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, তিনটে বাজে, এবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।

আমি তোমাকে তুমি করে বলছি আর তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন? তুমি করে না বললে যাব না।

আপনি আমার বস। তুমি করে বললে কেউ কিছু মনে করবে না। কিন্তু আমি যদি বলি, তা হলে সবাই অনেক কিছু মনে করবে।

যে যা মনে করে করুক, তাতে আমাদের কি?

আপনার কিছু না হলেও আমার হবে।

তা হলে আমিও তোমাকে আপনি করে বলব।

তানভীর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, আর একটা কথা, আপনার সিদ্ধান্তের কথাটা মা, দাদি ও মামার সঙ্গে আলাপ করেছেন?

না।

না করে বিয়ের কথা বলা উচিত হয়নি আপনার।

ও ভালো কথা মনে পড়েছে। কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

প্লীজ, আজ আর কোনো কথা নয়। অন্য দিন শুনব। খুব টায়ার্ড লাগছে।

ঠিক আছে, কাল অফিস আওয়ারের পর কোথাও বসা যাবে। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, এবার যাই বলে অঞ্জু চলে গেল।

পরের দিন বাসায় ফেরার সময় অঞ্জু তানভীরকে বলল, গতরাতের কথা মনে আছে তো?

তানভীর বলল, আছে।

তা হলে কোনো রেস্টুরেন্টে চলুন।

রেস্টুরেন্টে এসে নাস্তার অর্ডার দিয়ে অঞ্জু বলল, আমার এক মামাতো ভাই প্রায় ছয় সাত বছর আগে কানাডায় চাকরি করতে করতে সেখানে বিয়ে করে।

সম্প্রতি তার স্ত্রী একটা চার বছরের মেয়ে রেখে মারা গেছে। মামা তার মেয়েকে নিয়ে চলে আসতে বলেছেন। ওনার ইচ্ছা, আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ব্যবসা তার হাতে তুলে দেয়ার। কথা শেষ করে অঞ্জু একদৃষ্টে তানভীরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

তানভীর বলল, আপনার একমাত্র গার্জেন হিসাবে মামা ভালো কথাই বলেছেন।

তা আমিও জানি। কিন্তু বিয়ে করা তো দূরের কথা, ম্যানেজারই করব না। মামা অবসর নিতে চাচ্ছেন নেবেন, অন্য ম্যানেজার রাখব।

আপনার মামা কি কথাগুলো সরাসরি আপনাকে বলেছেন?

না, মাকে বলেছেন। কয়েকদিন আগে মা আমাকে বলেছে।

আপনার মা এব্যাপারে কিছু মতামত প্রকাশ করেন নি?

মামার প্রস্তাব মা সানন্দে গ্রহণ করেছেন।

মাকে আপনার মতামত বলেছেন?

বলেছি, শুনে খুব রেগে আছে। এই কয়েকদিন আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে নি।

মায়ের কথা শোনা ও তাকে খুশী করা সন্তানের একান্ত কর্তব্য।

সে কথা আমিও জানি। তবু এব্যাপারে তার কথা মানব না।

কেন?

একবার যে ভুল করেছি। দ্বিতীয়বার সেই ভুল আর করব না। তখন তেমন জ্ঞান হয়নি বলে মা বাবার কথায় বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম। এখন আর মায়ের কথায় রাজি হচ্ছি না। তা ছাড়া আপনাকে আমি মন প্রাণ উজাড় করে ভালবেসেছি। আপনি যদি আমাকে কোনো কারণে বিয়ে নাও করেন, তবু অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না।

আপনি কি জানেন, ভালবাসা মানে আবেগ আর উচ্ছাস? বিয়ের পর বাস্তব বড় কঠিন? বাস্তবের যাঁতাকলে পড়ে ভালবাসা করে বিয়ে করেও বিচ্ছেদ ঘটছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব জানি। আপনার কথাগুলো তরুণ-তরুণীদের জন্য প্রযোজ্য। ঐ বয়সটা অনেক আগেই পার করে এসেছি। ওসব কথা বলে আমাকে উপদেশ দেবেন না।

কিন্তু আপনার ফ্যামিলীতে একজন পুরুষ দরকার। মামা মারা যাওয়ার পর কে আপনাদের সবকিছু লক্ষ্য রাখবে?

কেন? আপনি।

আপনার সঙ্গে যদি পরিচয় না হত অথবা আমি যদি এখানে না আসতাম, তা হলে নিশ্চয় মামার প্রস্তাব গ্রহণ করতেন?

না, করতাম না। আপনি মামাকে যতটুকু চেনেন, আমি তার থেকে হাজারগুণ বেশি চিনি। তিনি বউ মারা যাওয়া ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমাদের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতে চান।

তবু বলব, ওনার প্রস্তাব আপনার মেনে নেয়া উচিত। কারণ যে-ই আপনাকে বিয়ে করবে, সে-ই আপনার সম্পত্তির মালিক হবে।

অঞ্জু ভেবেছিল, মামাত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা ও মামার মতলবের কথা শুনে তানভীরের জেলাস হবে এবং তাকে বিয়ে না করার জন্য কোনো পরামর্শ দেবে। তা না করে বরং বার বার মামার প্রস্তাব মেনে নেয়া উচিত বলায় খুব রেগে গেল। রেগে গেলে তার চোখে পানি এসে যায়। এখনও তাই হল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে চোখ মুছে বলল, আপনি আমাকে অনেকবার অপমান করেছেন। আর কত করবেন বলে আবার চোখ মুছল।

তানভীর বলল, শুভাকাঙ্খি হিসাবে যা বলা উচিত তাই বলেছি, আপনাকে অপমান করার জন্য কিছু বলি নি।

শুভাকাঙ্খি হিসাবে আপনাকে আমি চাই নি, স্বামী হিসাবে চাই। তাই আপনার ফাইন্যাল সিদ্ধান্ত আজ বলতেই হবে।

গতরাতে এ ব্যাপারে কয়েকদিন সময় চেয়েছি। আর আপনার দাদি, মা ও মামার সঙ্গে আপনাকে আলাপ করতেও বলেছি। ওনারা কি বলেন না বলেন, শোনার পর আমার সিদ্ধান্ত জানাব। চলুন, বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না।

হ্যাঁ, চলুন বলে অঞ্জু বিল মিটিয়ে বেরিয়ে আসার সময় বলল, একটা কথা জেনে রাখুন, দাদি, মা ও মামা যদি আপনাকে নাকচ করে দেন, তবু কিন্তু আপনাকে আমার চাই-ই চাই।

সব সময় অঞ্জু গাড়ির পিছনের সিটে বসে, এখন সামনের সিটে বসল।

তানভীর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, আপনি যে বললেন, আমাকে চান-ই চান, আমারও তো চাওয়ার কিছু থাকতে পারে।

কেন? আপনি কি আমাকে চান নি?

আমি সে চাওয়ার কথা বলি নি।

তা হলে কি চান বলুন, যা চাইবেন তাই দেব। নিজেকেও দেব, আর যদি বাড়ি, গাড়ি ও ব্যবসা উইল করে দিতে বলেন, তাও দেব।

ওসব আমি চাই না।

তা হলে কি চান বলবেন তো?

দো'য়া।

দো'য়া!

হ্যাঁ, দো'য়া। আমার মা ও তোমার মা, দাদি ও মামার দো'য়া চাই।

অঞ্জু জানে, ওনারা কেউ তানভীরের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হবেন না। তাই কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, ওনাদের কাছ থেকে তুমি আদায় করে নেবে।

আদায় করার যোগ্যতা যে আমার নেই।

কে বলেছে নেই? আপনার যা আছে, লক্ষ লক্ষ ছেলের মধ্যে তা নেই।

আপনি আমাকে ভালবাসেন তাই লক্ষ লক্ষ ছেলের চেয়ে আমাকে ভালো মনে করছেন, কিন্তু আপনার দাদি, মা ও মামার কাছে এতটুকু মূল্য আমার নেই। যেদিন ওনাদের কাছে যোগ্যতা প্রমাণ করে মূল্যবান হতে পারব, তক্বদিরে থাকলে সেদিন আমাদের বিয়ে হবে।

আর আমি যদি এখন তাদের কাছে আপনার যোগ্যতার প্রমাণ দেখিয়ে দো'য়া আদায় করতে পারি?

আপনার গার্জেনদের দো'য়া না হয় আদায় করতে পারবেন; কিন্তু আমার মায়ের দো'য়া কেমন করে আদায় করবেন?

সে ব্যাপারে আপনি যা করার করবেন।

দো'য়া আদায় করা পরের কথা, মা কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হবে না।

কেন?

মা শহরের মানুষদের অমানুষ মনে করে।

কেন বলুন তো?

ততক্ষণে তারা বাসায় পৌঁছে গেল।

গাড়ি পার্ক করে তানভীর অঞ্জুর দিকের গেট খুলে দিয়ে বলল, সেকথা পরে একদিন শুনবেন।

পরে নয়, আজই শুনব। রাত বারটার সময় আসব, জেগে থাকবেন বলে অঞ্জু চলে গেল।

তানভীর গাড়ি গ্যারেজে রেখে বারান্দায় উঠে জমিলা বেগমকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, দাদি কেমন আছেন?

জমিলা বেগম সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আল্লাহর রহমতে ভালো।

তানভীর বলল, বেশ কিছুদিন আপনাকে দেখিনি। কোথাও গিয়েছিলেন না কি?

কোথায় আর যাব? একটা ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তায় আছি। তাই তোমার কাছে যাই নি।

আপনার আবার কিসের চিন্তা? খাবেন-দাবেন, আল্লাহ-আল্লাহ করবেন।

হ্যাঁ ভাই, তুমি ঠিক বলেছ। যাও ভাই, এবার তোমার রুমে যাও। মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেল বলে জমিলা বেগম চলে গেলেন।

রাতে খাওয়ার পর তানভীর কিছুক্ষণ ফুলবাগানে বেড়িয়ে এসে একটা বই নিয়ে বসল। কিন্তু পড়ায় মন বসল না। তখন তার মায়ের কথা মনে পড়ল।

মা তাকে মাসে একবার করে দেখা দিয়ে যেতে বলে; কিন্তু ছুটি পায় না বলে তিন মাস অন্তর যায়। একবার মাকে ছুটি না পাওয়ার কথা জানিয়ে বলল, আল্লাহর রহমতে এখন আমি ভালো বেতন পাই। তুমিও ঢাকায় চল, বাসা ভাড়া নিয়ে দু'জনে থাকব।

আসমা খাতুন বললেন, তোর বাবা ঢাকার ছেলে হয়েও যখন এখানে শত দুঃখ কষ্ট পেয়েও ফিরে গেল না তখন আমি কি করে সেই ঢাকায় গিয়ে সুখে বাস করব? আমাকে আর কখনও ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলবি না। অঞ্জুকে বিয়ে করলে ঢাকায় হবে ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য। কিন্তু মা গ্রামে পড়ে থাকবে আর সে এখানে থাকবে, তা কি সম্ভব? তা ছাড়া মা শহরের মেয়েকে কিছুতেই পুত্রবধূ করবে না। এমন সময় দরজায় টোকা পড়তে চিন্তাটা ছিন্ন হয়ে গেল। ঘড়ি দেখল, বারটা। নিশ্চয় অঞ্জু এসেছে ভেবে দরজা খুলে দিল।

অঞ্জু ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসল।

তানভীর দরজা ভিড়িয়ে এসে বলল, কাজটা আপনি ভালো করছেন না।

অঞ্জু কপট রাগ দেখিয়ে বলল, একথা অনেকবার শুনেছি আর শুনতে চাই না। এখন আপনার মা কেন শহরের মানুষদের অমানুষ মনে করেন শুনতে চাই।

শোনাব; কিন্তু তার আগে প্রমিশ করুন, আর কখনও গভীর রাতে আমার রুমে আসবেন না।

অঞ্জু তার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ছলছল চোখে বলল, মনে হয় আপনি মানুষ নন, অন্য কিছু। যে কারণে আপনার হৃদয় পাথরের মতো শক্ত। তবু প্রমিশ করলাম বলে চোখ মুছল।

তানভীর বলল, আপনি বার বার আমাকে ভুল বুঝেন। আপনাকে দুঃখ দেয়ার জন্য প্রমিশ করতে বলি নি। বলেছি আপনার নির্মল চরিত্রে কেউ যেন দাগ কাটতে না পারে। আমি বাইরের ছেলে, আপনার গার্জেনরা যখন ইচ্ছা আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তাতে এতটুকু দুঃখ পাব না; কিন্তু আমার কারণে আপনাকে কেউ কিছু বললে, সে দুঃখ সহ্য করা আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে। এবার মায়ের কথা বলছি, বাবার কারণেই মা শহরের মানুষদের অমানুষ

মনে করে। বাবা ছিলেন ঢাকার কোটিপতির ছেলে। ওনারা দুই ভাই। বাবা ছিলেন ছোট। তিনি যখন ইংলিশে অনার্স নিয়ে মাস্টার্স করছিলেন তখন এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়ি ধুবচাচিয়ায় বেড়াতে গিয়ে ছিলেন। তারপর সেখানে বিয়ে করা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছিল বলে বলল, বাবা বা মা কেউ আমাকে এসব কথা জানায় নি। বাবা ডাইরীতে জীবনের সবকিছু ঘটনা লিখে রাখতেন। তার মৃত্যুর কিছুদিন পর সেই ডাইরীটা আমি পাই। পড়ে সবকিছু জানতে পারলাম।

অঞ্জু বলল, আপনার মাও এসব কথা বলেন নি?

তানভীর বলল, আগে সবকিছু শুনুন, তারপর প্রশ্ন করবেন।

ডাইরীটা পড়ে মাকে যখন বললাম, বাবা না হয় পরিচয় গোপন করেছিলেন; কিন্তু তুমি কেন তার পরিচয় জানালে না? তখন মা বলল, আমি তোকে জানাত চেয়েছিলাম; কিন্তু তোর বাবা নিষেধ করে বলেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর জানাবে আর সে যেন দাদা-দাদি বা চাচা-চাচির সঙ্গে কখনও দেখা না করে অথবা তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থী না হয়।" আমার যত দূর মনে হয়, দাদুর দুর্ব্যবহারের কারণে মা শহরের মানুষকে অমানুষ ভাবে।

অঞ্জু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমার বাবার কথা শুনে যেমন খুব কষ্ট হচ্ছে, তেমনি তোমর দাদুর উপর খুব রাগও হচ্ছে। যে লোক ছেলের কোনো কথা না শুনে ছেলে, বৌ ও তার বাবাকে তাড়িয়ে দেন, তিনি মানুষ হয়েও অমানুষ। আচ্ছা, তোমার দাদা-দাদি বা চাচা-চাচির কথা ডাইরীতে কিছু লেখা ছিল না?

হ্যাঁ, ছিল। চাচার তখন বিয়ে হয় নি। ঘটনার সময় উনি বাসায় ছিলেন না। আর দাদি কিছু বলতে গিয়েছিলেন; কিন্তু দাদু ওনাকে কিছু বলতে দেন নি। তবে বাবা যখন স্ত্রী ও শ্বশুরকে নিয়ে চলে আসেন তখন শুনতে পান, দাদি ওনাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য দাদুকে বারবার কাকুতি মিনতি করে অনুরোধ করেছিলেন।

আপনি তো ঢাকায় এসেছেন প্রায় দু'বছর, এর মধ্যে দাদা-দাদি ও চাচা-চাচির খোঁজ নেন নি?

মা বাবার নিষেধ সত্ত্বেও ওনাদেরকে একবার অন্তত দেখার খুব ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঠিকানা জানি না।

কেন, ডাইরীতে ঠিকানা লেখা ছিল না?

ছিল; কিন্তু ঢাকায় আসার পথে সেটা হারিয়ে ফেলেছি।

ঠিকানা মনে নেই?

না।

ডাইরীতে দাদা ও চাচার নাম নিশ্চয় লেখা ছিল?

হ্যাঁ, ছিল। বাবার আসল পরিচয় জেনে খুব টেনশন ফিল করছিলাম। তাই সবকিছু পাড়লেও ঠিকানা বা ওনাদের নামের কোনো গুরুত্ব অনুভব করিনি। শুধু দাদার নাম ইকবাল হোসেন মনে আছে। ঢাকায় পৌঁছে ডাইরীটা যখন পেলাম না তখন মনে হল, ঠিকানাটা নিজের ডাইরীতে না লিখে সাংঘাতিক ভুল করেছি।

দাদার নাম শুনে অঞ্জু মনে মনে চমকে উঠল। ভাবল, তার দাদার নামও ইকবাল হোসেন। কিন্তু বাবা তো ওনার একমাত্র সন্তান। উনি অন্য কোনো ইকবাল হোসেন হবেন। বলল, অনেকবার তো গ্রামের বাড়িতে গেছেন, মায়ের কাছ থেকে জেনে নিতে পারতেন?

সে চেষ্টা করিনি মনে করেছেন? প্রথমবারে গিয়ে যখন জানতে চাইলাম তখন বলল, কেন রে, ডাইরীতেই তো সবকিছু লেখা আছে। পড়িস নি? দাঁড়া এনে দিচ্ছি।

মা ডাইরীটা ঢাকায় নিয়ে আসতে নিষেধ করে বলেছিল, "ওটা তোর বাবার স্মৃতি। ওটাকে বুকে জড়িয়ে বাকি জীবন কাটাব।"

ঢাকায় আসার সময় মায়ের অজান্তে ডাইরীটা ব্যাগে নিয়েছিলাম। তাই মায়ের কথা শুনে ভয়ে ভয়ে ডাইরী নেয়ার ও হারিয়ে যাওয়ার কথা বললাম।

মা অনেকক্ষণ আমার দিকে রাগের সঙ্গে তাকিয়ে থেকে বলল, মায়ের কথা অমান্য করার শিক্ষা আমি তো তোকে দিই নি।

আমি মায়ের পা জড়িয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললাম, মস্ত বড় অন্যায় করে ফেলেছি। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। জীবনে আর কখনও তোমার কথা অমান্য করব না।

মাও চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, "সন্তানদের অনেক অন্যায় মায়েরা ক্ষমা করে; কিন্তু তুই যা করেছিস, তা ক্ষমার অযোগ্য। তবু তোকে ক্ষমা করলাম। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এটাই বুঝি আল্লাহর ইচ্ছা। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, ওনাদের নাম ঠিকানা আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করবি না।"

তারপর থেকে ডাইরীর কথা ও দাদা-দাদি বা চাচা-চাচির কথা মনে পড়লে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি।

অঞ্জু জিজ্ঞেস করল, মায়ের মতো আপনিও কি ঢাকার মানুষদের অমানুষ মনে করেন?

সব মানুষকে করি না, যারা অমানুষের মতো কাজ করে তাদেরকে করি।

অঞ্জু চিন্তা করতে লাগল, তানভীরের মা কিছুতেই তাকে পুত্রবধূ করবেন না। আর তানভীরও মায়ের অমতে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। এদিকে মামা আমাকে পুত্রবধূ করতে চান। মাও রাজি। কিন্তু তানভীরকে ছাড়া কাউকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বিয়ের কথা শুনলে সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে তানভীর বলল, খুব গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন মনে হচ্ছে?

অঞ্জু এতক্ষণ বাস্তবে ছিল না। তাই তানভীরের কথা তার কানে গেল না। তবে সম্বিত ফিরে পেল। জিজ্ঞেস করল, কিছু বললেন?

কি এত চিন্তা করছেন?

আপনার মায়ের কথা।

স্ট্রেঞ্জ! আমার মায়ের কথা আমি চিন্তা করব, আপনি করছেন কেন?

না, মানে ওনার কথা যা বললেন, উনি তো আমাকে ছেলের বৌ করবেন না।

কারেক্ট।

আপনি চেষ্টা করবেন না মাকে রাজি করাতে?

চেষ্টা করা তো দূরের কথা, মাকে বলার সাহসই আমার নেই।

অঞ্জু রেগে উঠে বলল, কাপুরুষ।

কারেক্ট।

অঞ্জু আরো রেগে উঠে বলল, সবকিছু কারেক্ট কারেক্ট. হলে আমাকে ভালবাসলেন কেন?

আমি কি কখনও বলেছি আপনাকে ভালবাসি?

মুখে না বললেও আপনার শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ বলেছে।

ওটা আপনার মনের ভুল।

যদি তাই হয়, ভুল ভাঙ্গিয়ে না দিয়ে প্রশ্রয় দিলেন কেন?

প্রশয় আমি দিই নি, আপনি নিজেই প্রশয় দিতে বাধ্য করেছেন।

কোনো কথাতেই তানভীরের সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে অঞ্জু ক্রমশঃ রেগে উঠছে। খুব রাগের সঙ্গে বলল, আপনার মনে যদি এই ছিল, তা হলে প্রথমে যেদিন ভালবাসার কথা জানালাম, সেদিন কিছু বললেন না কেন? আসলে সব পুরুষই এক। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে। আপনি খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী; কিন্তু একথা বোধ হয় জানেন না, কারো মনে কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা

করেন না। আর সারাজীবন অশান্তি ভোগ করে। শুনুন, কাল আমি অফিস যাব না। আপনি অফিস থেকে এই মাসের ও আগামী তিন মাসের বেতন নিয়ে চলে যাবেন। আমি ফোন করে একাউন্টেন্ট সাহেবকে বলে দেব। আপনার মতো কাপুরুষের মুখ আমি আর দেখতে চাই না।

তানভীর কিছু না বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

তাকে ঐভাবে হাসতে দেখে অঞ্জু আরো রেগে গেল। বলল, আপনার মতো নির্লজ্জ কাপুরুষ সারা পৃথিবীতে মনে হয় দ্বিতীয় নেই।

তানভীর হাসি মুখেই বলল, কারেক্ট।

অঞ্জু রাগ সহ্য করতে পারল না। খুব জোরে তার গালে একটা চড় মেরে হন হন করে বেরিয়ে নিজের রুমে এসে খাটের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

সন্ধ্যের সময় বাসায় ফিরে যখন অঞ্জু তানভীরকে রাত বারটার সময় তার রুমে যাওয়ার কথা বলে তখন জমিলা বেগম বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন। তা ছাড়া নাতনি যে ড্রাইভার তানভীরকে অন্য চোখে দেখে তা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আজ রাত বারটায় তার রুমে যাওয়ার কথা শুনে ভাবলেন, নিশ্চয় মাঝে মাঝে ঐ সময়ে যায়। কি কথা শোনার জন্য আজ যাবে জানা দরকার। তাই রাতে খাওয়ার পর না ঘুমিয়ে নাতনির রুমের দিকে লক্ষ্য রাখলেন।

ঠিক বারটার সময় নাতনিকে যেতে দেখে একটু পরে এসে তানভীরের দরজার কাছে না দাঁড়িয়ে বারান্দার দিকে জানালার কাছে এসে পর্দা অল্প একটু ফাঁক করে দাঁড়ালেন। তারপর তাদের আলাপ শুনতে শুনতে তানভীর যখন তার বাবার নাম ও বিয়ের ঘটনা এবং শেষে যখন দাদার নাম ইকবাল হোসেন বলল তখন তানভীর যে তার ছোট ছেলের ঘরের নাতি নিশ্চিত হলেন। ত্রিশ বছর পর সামসুদ্দিন মারা গেছে শুনে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলেন। রুমে গিয়ে তানভীরকে জড়িয়ে এতবছর বুকের জ্বালা নেভাতে ইচ্ছা হলেও নাটকের শেষ অঙ্ক কি হয় জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর তাদের ভালবাসার কথা জেনে খুব আনন্দিত হলেও তানভীরের মুখে তার মায়ের কথা শুনে মনে হোঁচট খেলেন। শেষে অঞ্জু তার গালে চড় মারতে নাতনির উপর খুব রেগে গেলেন। অঞ্জু দোতলায় চলে যাওয়ার পর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তানভীরের রুমে ঢুকলেন।

তানভীর তখনও দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওনাকে দেখে খুব অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওনার চোখে পানি দেখে বলল, কি ব্যাপার দাদি এ সময়ে এখানে? কাঁদছেনই বা কেন?

ঘটনার পরিপ্রেক্ষীতে জমিলা বেগম স্বামীর সাবধান বাণী আগেই ভুলে গেছেন। তানভীরের কথার উত্তর না দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, আমিই তোর দাদি। যেদিন তোর বাবা তোর মা ও নানাকে নিয়ে এসেছিল, সে দিন তোর দাদা তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করে ফিরিয়ে আনতে বলেছিলাম; কিন্তু শোনে নি। তোর চাচা তখন বাসায় ছিল না। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর এসে ঘটনা শুনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইলে তাকেও নিষেধ করে বলেছিল, "তুই যদি ওনাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসিতে যাস, তা হলে সামসুদ্দিনের মতো তোরও এবাড়ির গেট চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ কথা শুনে তোর চাচা আর যায় নি। শুধু তাই নয়, তোর দাদার জান এত শক্ত ছিল যে, মারা যাওয়ার আগে আমাকেও তোর চাচাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, আমার ভবিষ্যৎ বংশধররা সামসুদ্দিনের কথা যেন না জানে। তারা জানবে, এহতেশাম উদ্দিন আমার একমাত্র সন্তান। তাই আমি ও তোর চাচা অঞ্জুকে ও তার মাকে জানাই নি।

সবকিছু জেনে তানভীর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আমিও বাবার আসল পরিচয় জানতাম না। তারপর কি করে জানল ও বাবার সাবধান বাণীর কথা বলে দাদিকে বসিয়ে কদমবুসি করে তার পাশে বসে বলল, এটা আল্লাহ আমাদের তক্বদীরে লিখেছেন। আর প্রত্যেক মুসলমানকে তক্বদীর বিশ্বাস করতেই হবে। তারপর বলল, মনে হচ্ছে, আপনি বাইরে থেকে আমাদের সব কথা শুনেছেন? কিন্তু এত রাতে এসেছিলেন কেন?

জমিলা বেগম বললেন, প্রথম যেদিন তুই এখানে এলি সেদিন তোর চেহারার সঙ্গে সামসুদ্দিনের মিল দেখে মনে হয়েছিল তুই তারই ছেলে। তাই মাঝে মাঝে তোকে দেখার জন্য এলেও তোর দাদার সাবধান বাণীর কথা ভেবে পরিচয় জানতে চাই নি।

এবার এসব কথা থাক দাদি, রাত শেষ হয়ে এল। আপনি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।

হ্যাঁ ভাই যাই। আজ বহু বছর পর আল্লাহ আমার বুকের জ্বালা নেভালেন। তোর বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে ভালো করে ঘুমাতে পারতাম না। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতাম। তোর দাদা জানতে পারলে রাগারাগি করতো। তাই সে ঘুমিয়ে পড়লে বারান্দায় গিয়ে কাঁদতাম। ধরা যে পড়ি নি তা নয়। যতবার ধরা পড়েছি ততবার রাগারাগি করেছে। তারপর চোখ মুছে বললেন, তুই যেন অঞ্জুর উপর রাগ করে সত্যি সত্যি চলে যাস নি।

ঠিক আছে, আপনি এবার যান।

জমিলা বেগম দু'হাতে তার মাথা ধরে কপালে কয়েকটা চুমো খেয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

তানভীর ঘড়ি দেখল, রাত তিনটে। না ঘুমিয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে জামা কাপড় গুছিয়ে ব্যাগে ভরে নিয়ে অঞ্জুকে চিঠি লিখতে বসল।

অঞ্জু,

হয়তো আপনার কথাই ঠিক। নির্লজ্জ, কাপুরুষ ও হৃদয়হীন বলে হয়তো আপনার ভালবাসাকে গ্রহণ করতে পারলাম না। তবে এ কথাও ঠিক, আমি আপনাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে হান্ড্রেস পার্সেন্ট ভালবাসি। তাই আপনার ভর্ৎসনা শুনে ওগালে চর খেয়েও এতটুকু রাগি নি। আপনি যখন আমার মুখ আর দেখতে চান না তাখন আমার দেখানও উচিত না। তাই ভালবাসার গোলাপ ও বিদায় অশ্রু রেখে গেলাম, যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করবেন। কোনোটাই যদি গ্রহণ করতে না পারেন, তা হলে আমার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে নতুন জীবন শুরু করবেন। তা হলে আমি শান্তি পাব। আর একটা কথা বলে ইতি টানব, আপনার মামাত ভাইকে বিয়ে করুন বা না করুন, আপনার মামা জাল দলিল করে ব্যবসা ও বাড়ি ওনার নিজের নামে করার ব্যবস্থা করেছেন। এখনও রেজেস্ট্রি হয় নি। দলিলটা অফিসে ওনার নিজস্ব স্টীলের আলমারিতে আছে। কথাটা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে যা সত্য তাই বললাম। আর একটা কথা, যে কোনো ফাইলে সিগনেচার করার আগে ভালো করে চেক করে নিবেন। আল্লাহ আপনার জীবন সুখের ও শান্তির করুক এই কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রেখে পেপার ওয়েট চাপা দিল। এমন সময় ফজরের আজান হচ্ছে শুনে আজানের জওয়াব ও দো'য়া শেষ করে নামায পড়ল। তারপর ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল।

গ্রামে পৌঁছাতে তানভীরের সন্ধ্যে হয়ে গেল। মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ে যখন ঘরে এল তখন আসমা খাতুন নামায পাটিতে বসে তসবিহ পড়ছিলেন।

তানভীর মাকে সালাম দিয়ে কদমবুসি করে বলল, কেমন আছ মা?

আসমা খাতুন সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আল্লাহর রহমতে ভালো, তুই ভালো আছিস তো?

হ্যাঁ মা, আল্লাহ রহমতে ও তোমার দো'য়ার বরকতে ভালো আছি।

যা, ঘরে গিয়ে জামা কাপড় পাল্টে বস, আমি নাস্তা নিয়ে আসছি।

রাতে খাওয়ার পর আসমা খাতুন ছেলেকে বললেন, স্কুলের সেক্রেটারি সাহেব কয়েকদিন আগে এসেছিলেন। বললেন, তুই নাকি ঢাকায় ড্রাইভারীর চাকরি করিস?

তানভীর বলল, হ্যাঁ করি।

আমাকে বলিস কি কেন?

তুমি মনে ব্যথা পাবে বলে।

তুই বললে যতটা ব্যথা পেতাম, অন্যের কাছে জেনে তার থেকে যে বেশি ব্যথা পাব, সে কথা ভাবিস নি?

মাফ করে দাও মা। কোনো চাকরি না পেয়ে ড্রাইভারীর চাকরি নিই। তখন ভেবেছিলাম ভালো কিছু একটা পেলে ড্রাইভারী ছেড়ে দেব।

দু'বছর হয়ে গেল, ভালো কিছু পেয়েছিস?

না। ড্রাইভারীর চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে বলতে গিয়েও তানভীর বলল না।

শোন, যত টাকাই বেতন হোক, ড্রাইভারীর চাকরি করা ঠিক নয়। তুই আর ঢাকায় যাবি না। এখানেই কিছু করার চেষ্টা কর। ঐ দিন যাওয়ার সময় সেক্রেটারি সাহেব বললেন, "তানভীর বাড়িতে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।" কাল ওনার সঙ্গে দেখা করবি। উনি যদি তোকে স্কুলে নিতে চান, না করবি না।

তানভীর বলল, ঠিক আছে মা, তাই হবে।

আসমা খাতুন ছেলে আসা অব্দি তার মন খারাপ দেখেছেন। ভেবেছেন, জার্নি করে এসেছে, তাই হয়তো শরীর ও মন খারাপ। এখন স্কুলে মাস্টারী করার কথা বলতেই রাজি হয়ে যেতে কেমন যেন সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলেন, তোর মন খারাপ কেন? এর আগে ঢাকা থেকে আসার পর কখনও মন খারাপ দেখিনি।

তানভীর মায়ের কাছে কখনও মিথ্যা বলে না। কি বলবে ভাবতে লাগল।

কিরে, কিছু বলছিস না কেন? যার চাকরি করিস তার সঙ্গে কোনো গোলমাল হয়েছে?

না, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।

ভালই করেছিস। এতে মন খারাপের কি আছে?

তানভীর হেসে ফেলে বলল, থাকা-খাওয়া ফ্রি, বেতন দশ হাজার। মনতো একটু খারাপ হবেই।

তোর কথা অবশ্য ঠিক। তবে আল্লাহ মুখ তুলে চাইলে এখানেও ঐ টাকা রোজগার করতে পারবি। তা হ্যাঁরে, হঠাৎ চাকরিটা ছেড়ে দিলি কেন?

মালিক আমাকে দিয়ে এমন কাজ করাতে চাচ্ছিলেন, যা আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়। তাই ছেড়ে দিলাম।

তোর কথা শুনে খুব খুশী হলাম। একদম মন খারাপ করবি না। আল্লাহ হয়তো এর মধ্যে কোনো মঙ্গল রেখেছেন। তারপর বললেন, অনেক পথ জার্নি করে এসেছিস, এবার ঘুমিয়ে পড় বলে আসমা খাতুন সেখান থেকে চলে এলেন।

স্কুলের সেক্রেটারি হামিদ সাহেব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। ওনার দুই ছেলে দুই মেয়ে। বড় ছেলে চাষ বাস দেখাশোনা করে। ছোট ধুবচাচিয়া টাউনে কাপড়ের দোকান চালায়। বড় মেয়ে কিশোর বয়সে মারা গেছে। ছোট মাহমুদা ধুবচাচিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে এ বছর বি. এ. পাস করেছে। মাহমুদার গায়ের রং শ্যামলা হলেও দেখতে মোটামুটি সুন্দরী। স্কুল কলেজে পড়লেও ধর্মের আইন কানুন মেনে চলে। সাবালক হওয়ার পর বোরখা পরে স্কুল কলেজে গেছে। একই গ্রামের ছেলে হিসাবে তানভীরকে চেনে। তানভীরও তাকে চেনে।

হামিদ সাহেব তানভীরের বাবার সবকিছু জানেন। তিনি তানভীরকে জামাই করতে চান। তাই তার খোঁজ খবর রাখেন।

পরের দিন সকালে নাস্তা খেয়ে তানভীর সেক্রেটারী হামিদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বৈঠকখানায় কাউকে দেখতে না পেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

মাহমুদা কাজের ছেলে আশফাককে খুঁজতে এসে বৈঠকখানায় তানভীরকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, আরে তানভীর ভাই যে, কেমন আছেন?

সালামের উত্তর দিয়ে তানভীর বলল, ভালো। তুমি কেমন আছ?

ভালো, তা কি মনে করে এসেছেন?

তোমার আব্বার সঙ্গে দেখা করতে।

আব্বা ঘরে আছে, আপনি বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

মাহমুদা ঘরে গিয়ে আব্বাকে বলল, তানভীর ভাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

হামিদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তুই জানলি কি করে?

আমি আশফাককে দোকানে পাঠাব বলে ডাকতে গিয়েছিলাম। দেখি উনি বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে আছেন।

হামিদ সাহেব খুশী হয়ে বললেন, আমি যাচ্ছি। তোর মাকে কারো হাতে চা বিস্কুট পাঠাতে বল।

তানভীর বৈঠকখানায় বেঞ্চে বসেছিল। ওনাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিল।

হামিদ সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, বস। তারপর নিজেও বসে জিজ্ঞেস করলেন, কবে এসেছ?

কাল।

তোমার মা নিশ্চয় আসতে বলেছে?

জি।

তুমি ঢাকায় ভালো বেতনে চাকরি কর শুনে খুশী হয়েছিলাম। কিছুদিন আগে জানতে পারলাম, ড্রাইভারীর চাকরি কর। শুনে খুব খারাপ লাগল। তুমি একজন স্বনামধন্য শিক্ষকের ছেলে। তা ছাড়া উচ্চশিক্ষিতও। ড্রাইভারীর চাকরি করবে ভাবতেই পারি নি।

তানভীর বলল, বেয়াদবি মাফ করবেন। ন্যায় পথে থেকে যে কোনো কাজ করে উপার্জন করতে যারা লজ্জাবোধ করে তাদের দলে আমি নই।

তুমি অবশ্য ঠিক কথা বলেছ। তবে কি জান বাবা, ড্রাইভাররা বেশিরভাগ নেশা টেশা করে। তাই ওদেরকে সবাই ভালো নজরে দেখে না। থাক ওসব

কথা, যে কথা বলার জন্য তোমাকে আসতে বলেছি সে কথা বলি। তোমার বাবার মতো ভালো শিক্ষক আমি দেখি নি। তুমি তারই ছেলে। তোমাকেও আমরা ভালো বলেই জানি। তাই তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর হেড মাস্টার ও আমি তোমাকে স্কুলে নিতে চেয়েছিলাম। তুমি রাজি না হয়ে ঢাকায় চলে গেলে। সেখানে ড্রাইভারী করছ জেনে একদিন তোমার মাকে সেকথা জানিয়ে বলেছিলাম, "এখনও তোমাকে আমাদের স্কুলে নিতে আগ্রহী। তুমি বাড়িতে এলে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।"

এমন সময় একটা কাজের মেয়ে ট্রেতে করে চা বিস্কুট নিয়ে এল।

হামিদ সাহেব বললেন, নাও, চা খাও।

তানভীর বলল, এসব আনতে বললেন কেন? আমি তো নাস্তা খেয়েই এসেছি।

হামিদ সাহেব বললেন, তাতে কি হয়েছে, একটু চা খেলে কিছু হবে না।

তানভীর বিস্কুট খেল না, শুধু চা খেয়ে ট্রেতে কাপ পিরিচ রেখে দিল।

কাজের মেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেটা নিয়ে চলে যাওয়ার পর হামিদ সাহেব বললেন, তুমি যদি রাজি থাক, পরশু স্কুল কমিটির মিটিং আছে। তোমাকে নেয়ার ব্যবস্থা করব। তারপর হেসে ফেলে বললেন, ব্যবস্থা আর কি করব? হেড মাস্টার ও কমিটির মেম্বাররা সবাই তোমাকে চায়।

তানভীর বলল, মায়েরও যখন ইচ্ছা ঢাকায় চাকরি না করে এখানকার স্কুলে শিক্ষকতা করি তখন আর অমত করব না।

হামিদ সাহেব আলহামদুলিল্লাহ বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম।

এবার তা হলে আসি চাচা বলে তানভীর সালাম বিনিময় করে চলে এল।

তানভীরকে চলে যেতে বলে ও তার গালে চড় মেরে অঞ্জু সারা রাত শুধু কেঁদেছে। তার বিবেক বারবার ধীক্কার দিয়ে বলেছে, কাজটা তুই মোটেই ভালো করিস নি। তানভীর খুব ভালো ছেলে নচেৎ অন্য কোনো ছেলে হলে তোর যে কোনো ক্ষতি করতে পারত। তা ছাড়া তুই তাকে নিজের থেকে বেশি ভালবাসিস। তার গালে চড় মেরে ভালবাসাকে অপমান করলি কি করে? তোর উচিত এক্ষুনি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

বিবেক ধিক্কার দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কথা বললেও অঞ্জু লজ্জায় তা করতে পারল না।

তার বিবেক আবার বলে উঠল, কেঁদে কোনো ফল হবে না। তোর কান্না তো তানভীর জানছে না। তার মুখ আর দেখবি না বলে চলে যেতে বলেছিস। সে যদি সত্যি সত্যি চলে যায়, তা হলে সারাজীবন কাঁদতে হবে। তাই বলছি, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে এক্ষুনি ক্ষমা চেয়ে নে।

জমিলা বেগম তানভীরের রুম থেকে বেরিয়ে নাতনিকে বকাবকি করার জন্য তার রুমে এসে দেখলেন, শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

বুঝতে পারলেন, রাগের মাথায় তানভীররের গালে চড় মারলেও এখন অনুতপ্ত। তার পাশে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে প্রবোধ দিতে দিতে বললেন, যখন তাকে যা তা করে বলে চলে যেতে বললি, তার গালে চড় মারলি তখন তোর বিবেক কোথায় ছিল? এখন কেঁদে কি হবে?

অঞ্জু কান্না থামিয়ে খুব অবাক হয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, এসব আপনি জানলেন কি করে?

নিজের চোখে দেখেছি ও শুনেছি।

অঞ্জু দাদিকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি। ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আপনি এসব কথা মাকে বলবেন না।

জমিলা বেগম বললেন, ঠিক আছে, বলব না। তারপর বললেন, তুই যে তানভীরকে ভালবেসে ফেলেছিস, তা আমি অনেক আগেই টের পেয়েছি।

দাদির কথা শুনে অঞ্জু ভয়ার্তস্বরে বলল, মা টের পেয়েছে কি না জানেন?

না, জানি না।

মনে হয় পায় নি। পেলে খুব রাগারাগি করতো।

জমিলা বেগম মুচকি হেসে বললেন, তা তো করতই। তবে তানভীরের পরিচয় পেলে রাগারাগি করত না। বরং খুশী হত। আর তুইও তাকে যাতা করে বলে চলে যেতে ও তার গালে চড় মারতে পারতিস না। তুই ওর বায়োডাটা জেনেছিস আর আমি ওর যে পরিচয় জেনেছি, তা শুনলে শুধু তোর না, তোর মায়েরও পীলে চমকে উঠবে।

কি বলছেন, মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। বায়োডাটা ছাড়াও আমি তো ওর গ্রামের বাড়ির সবকিছু জানি। অন্য কোনো পরিচয় আবার আছে নাকি?

নিশ্চয় আছে।

কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তানভীর বলেছে।

তা হলে ভূমিকা না করে বলে ফেলুন।

বলব, তবে একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত?

তুই যেমন রেগে গিয়ে তানভীরের গালে খুব জোরে চড় মেরেছিস, ঠিক সেই ভাবে আমিও তোর গালে একটা চড় মারতে চাই।

দাদির কথা শুনে অঞ্জুর চোখে আবার পানি এসে গেল। চিন্তা করল, নিশ্চয় দাদি তানভীরের এমন কোনো পরিচয় জেনেছেন, যে জন্য তাকে চড় মারার প্রতিশোধ নিতে চান। চোখ মুছে বলল, ঠিক আছে, শর্তটা মেনে নিলাম। এবার বলুন।

শর্ত যখন মেনে নিলি, তখন মাফ করে দিলাম।

অঞ্জু জিজ্ঞেস করল, ওকি আপনার কোনো আত্মীয়ের ছেলে?

আত্মীয়ের ছেলে হতে যাবে কেন? ও এবাড়ির ছেলে।

অঞ্জু অবাক হয়ে বলল, এ বাড়ির ছেলে মানে?

মানে আবার কি? তানভীর তোর ছোট চাচা সামসুদ্দিনের ছেলে।

অঞ্জু খুব অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আব্বাই তো আপনাদের একমাত্র সন্তান?

না, আমাদের দুই ছেলে। তোর বাবা বড়। সামসুদ্দিন ছোট। বন্ধুর সঙ্গে তাদের গ্রামে বেড়াতে গিয়ে একটা গরিবের মেয়েকে বিয়ে করে এনেছিল বলে তোর দাদা বৌ ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে সব ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। তখন তোর বাবার বিয়েও হয় নি। তারপর যা কিছু ঘটেছিল বললেন।

তানভীর যা বলেছিল, দাদির কথার সঙ্গে মিলে যেতে অঞ্জু কান্নাজড়িত স্বরে বলল, আপনি এতদিন সে কথা বলেন নি কেন?

তোর দাদা কাউকে বলতে নিষেধ করেছিল। তোর বাবাকেও নিষেধ করেছিল।

মা তা হলে চাচার কথা জানে না?

না।

এখন দাদার নিষেধ অমান্য করলেন কেন?

তোর জন্য।

আমার জন্য?

হ্যাঁ, তোর জন্য। তানভীর ওর বাবার মতো দেখতে। তাই প্রথম দিন যখন আসে তখন ওকে দেখেই মনে হয়েছিল সামসুদ্দিনের ছেলে। ভয়ে ওর পরিচয় জানতে চাই নি। তুই ওকে ভালোবেসে ফেলেছিস জেনে খুব খুশী হয়েছি। তাই

সব সময় নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দো'য়া করি, তোদের যেন বিয়ে হয়। আজ অফিস থেকে ফিরে যখন তানভীরকে বললি, রাত বারটায় তার কাছে যাবি তখন আমি বারান্দায় ছিলাম। শুনে ভাবলাম, কেন যাবি জানতে হবে। তাই তুই যখন ওর রুমে গেলি তখন আমিও তোর পিছন পিছন এসে জানালার পর্দা সরিয়ে তোদের সবকিছু দেখেছি ও শুনেছি। তুই তানভীরকে ভুল বুঝেছিস জেনে ভাবলাম, তানভীর যদি সত্যি চলে যায়, তা হলে তুই যেমন তাকে কোনোদিন পাবি না তেমনি আমি পেয়েও তার বাবার মতো তাকেও চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলব। তাই তুই যখন ওর রুম থেকে চলে এলি তখন রুমে ঢুকি। তারপর তানভীরকে পরিচয় দিয়ে বললাম, তোর কথায় রাগ করে যেন চলে না যায়। চল আমার সঙ্গে, তার কাছে মাফ চাইবি।

তানভীর তার চাচাত ভাই জেনে অঞ্জু যেমন আনন্দে আত্মহারা হল তেমনি তার গালে চড় মারার জন্য অনুশোচনার আগুনে পুড়তে ছিল। তবু দাদির কথা শুনে বলল, ও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন আর যাব না। সকালে আমি একা গিয়ে মাফ চাইব।

ঠিক আছে, তাই করিস বলে জমিলা বেগম সেখান থেকে চলে গেলেন।

দাদি চলে যাওয়ার পর অঞ্জুর মন এক্ষুনি তার কাছে মাফ চাওয়ার জন্য তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও গেল না। শুয়ে শুয়ে তানভীরকে নিয়ে স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে গেল। কাকদের কর্কশ কণ্ঠের কা-কা ডাক শুনে বাস্তবে ফিরে এল। ঘড়ি দেখল, সাড়ে পাঁচটা। ভাবল, বাসার কেউ ওঠার আগে তানভীরের রুমে গিয়ে মাফ চেয়ে নেবে। তাড়াতাড়ি বাথ রুম থেকে এসে সামান্য প্রসাধন করে নেমে এল। রুমে ঢুকে তানভীর নেই দেখে চমকে উঠল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে চলে গেছে বুঝতে পেরে স্ট্যাচুর মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একসময় তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। হঠাৎ টেবিলের উপর পেপার ওয়েট চাপা একটা কাগজ দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। কাগজটা পড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে টেবিল ধরে চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর চোখ মুখ মুছে উপরে এসে দাদির রুমে ঢুকল।

জমিলা বেগম নামায শেষ করে অজিফা পড়ছিলেন। নাতনিকে থমথমে মুখে ঢুকতে দেখে বললেন, তানভীরের কাছে মাফ চাইতে গিয়েছিলি?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম বলে কাগজটা ওনার হাতে দিল।

কাগজটা পড়ে জমিলা বেগম রাগের সঙ্গে বললেন, যাবে না কি থাকবে? তুই তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিস, তারপরও সে থাকে কি করে? তক্ষুনি গিয়ে

মাফ চাইলে হয়তো যেত না। নাতনির চোখ থেকে পানি পড়তে দেখে আবার বললেন, এখন আর কেঁদে কি হবে? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এত লেখাপড়া করলি জ্ঞান বলতে কিছু হল না। তারপর নিজের চোখ মুছে বললেন, সামসুদ্দিনের জন্য এত বছর কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে বলেছি তাকে ফিরিয়ে দিতে। তাকে আল্লাহর দুনিয়া থেকে তুলে নিলে ও তার ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। তুই তাকে দূরে সরিয়ে দিলি। কথা শেষ করে আবার চোখ মুছলেন।

অঞ্জু বলল, তার গ্রামের বাড়ির ঠিকানা জানি। যেমন করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনব।

সমুদ্রে জাহাজ দুর্ঘটনার পর কোনো যাত্রী সাঁতার কাটতে কাটতে পরিশ্রান্ত হয়ে ডুবে যাওয়ার সময় একটা তক্তা বা অন্য কোনো অবলম্বন পেয়ে যেমন বাঁচার স্বপ্ন দেখে, অঞ্জু তানভীরের গ্রামের বাড়ির ঠিকানা জানে শুনে জমিলা বেগমও তেমনি নাতিকে ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ দাদি, সত্যি বলছি।

জমিলা বেগম মন ভার করে বললেন, তানভীর ওর বাবার সবকিছু পেয়েছে। সামসুদ্দিন বাবার কথায় কষ্ট পেয়ে সেই যে চলে গেল, আর এল না। তানভীরও যদি তোর কথায় মনে কষ্ট পেয়ে না আসে তখন কি করবি?

আসবে না মানে, নিশ্চয় আসবে। পড়েন নি, চিঠিতে লিখেছে "রেখে গেলাম ভালবাসার গোলাপ ও বিদায় অশ্রু, যে কোনো একটা গ্রহণ করো।" আমি ভালবাসার গোলাপ গ্রহণ করব।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু গতরাতে তার কথা শুনে বুঝেছি, তুই যদি ভালবাসার গোলাপ নিস, তা হলে তোকে তার গ্রামের বাড়িতে থাকতে হবে।

আমি ভালবাসার জালে জড়িয়ে এখানে নিয়ে আসব।

মনে হয় সে কিছুতেই আসবে না।

আপনার একথা মনে হল কেন?

তুই তাকে যতই ভালবাসার জালে জড়াস না কেন নিয়ে আসতে পারবি না।

কেন পারব না? পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যাকে ভালবাসা দিয়ে জয় করা যায় না।

তোর কথা ঠিক হলেও তানভীর তাদের দলে নয়। সে তার মায়ের মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। এমন কি মায়ের অনুমতি ছাড়া তোকে বিয়েও করতে পারবে না।

তার মাকেও একই পদ্ধতিতে নিয়ে আসব। তাতেও যদি সফল না হতে পারি, তা হলে ভাগ্যকে মেনে নেব। তবু আমি তানভীরকে পেতে চাই।

জমিলা বেগম নাতনিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তানভীরের লিখে রেখে যাওয়া কাগজটা পড়ে বুঝেছি, সেও তোকে নিজের থেকে বেশি ভালবাসে। তুই কতটা ভালবাসিস জানার জন্য এত কিছু বললাম। দো'য়া করি, "আল্লাহ তোর মনের বাসনা পূরণ করুক।" প্রয়োজনে আমি তোকে সাহায্য করব। তারপর বললেন, চিঠিতে তোর মামার কুমতলবের কথাও লিখেছে। সে ব্যাপারে চিন্তা করবি না?

কিছু দিন থেকে মামাকে আমারও কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে। উনি আগের থেকে বেশি আমার ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখছেন। আচ্ছা দাদি, মাকে দলিলের কথা জানালে কেমন হয়?

তোর মা তো বড় ভাই বলতে অজ্ঞান। কথাটা বিশ্বাসই করবে না। উল্টে তোকে তার কথামতো চলতে বলবে।

তা হলে কি করব বলবেন তো?

জমিলা বেগম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তুই যেমন করে হোক দলিলটা তোর মামার স্টীলের আলমারি থেকে নেয়ার চেষ্টা কর। যদি নিতে পারিস, তা হলে তানভীরের কথা সত্য কিনা জানা যাবে। সত্য হলে আমরা উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করার করব।

সত্য হলে মাকে জানাতে দোষের কিছু আছে?

আছে। তোর মা তার কানাডার ভাইপোর সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায়। দলিলটা দেখে হয়তো বলবে, "একদিন সবকিছুতো জামাই-ই পাবে। তাই তোর মামা আগেই পাকা করে রাখতে চায়।" যা বলছি শোন, তোর মামাত ভাই রাকেশ কানাডা থেকে আসার আগে তানভীরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ ব্যাপারে একমাত্র সেই-ই তোকে সাহায্য করতে পারবে। কারণ সে এই সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক।

কিন্তু রাকেশ ভাইতো কয়েকদিনের মধ্যে আসবে বলে জানি। এর মধ্যে তানভীরকে কি ফিরিয়ে আনতে পারব?

কয়েকদিন পরে আসার কথা থাকলেও আসতে পারবে না, অন্ততঃ দু'তিন মাস পরে আসবে।

আপনি কার কাছে শুনলেন?

কাল যখন তোর মামা তোর মাকে বলছিল তখন আমিও সেখানে ছিলাম। যে অফিসে চাকরি করে সেই অফিসের সাহেব দু'মাস পরে আসতে বলেছে। তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস দলিলটা হাত করার চেষ্টা কর।

এমন সময় বুয়া এসে বলল, আম্মা আপনাদেরকে নাস্তা খেতে ডাকছেন।

দাদি নাতিনে কথা বলতে বলতে বেলা আটটা বেজে গেছে কারো খেয়াল নেই। বুয়ার কথায় খেয়াল হতে ঘড়ি দেখে অঞ্জু বলল, তুমি যাও, আমরা আসছি। বুয়া চলে যাওয়ার পর দাদিকে বলল, তানভীর চলে গেছে মাকে এখন বলব?

আগে বেড়ে বলার দরকার নেই। বুয়া তার নাস্তা নিয়ে ফিরে এলেই তোর মা জানতে পারবে। তখন কিছু জিজ্ঞেস করলে বুদ্ধি খাটিয়ে উত্তর দিবি।

তানভীর ছোট চাচার ছেলে, একথা কি বলব?

না। যা বলার আমি বলব। এবার নাস্তা খেতে যাই চল, দেরি দেখলে তোর মা বুয়াকে আবার ডাকতে পাঠাবে।

দাদি নাতনি নাস্তার টেবিলে এলে লুবাবা বেগম শাশুড়ীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ডাক্তার আপনাকে আটটার মধ্যে নাস্তা খেতে বলেছেন, ঠিক টাইম মতো না খেলে গ্যাস্টিক বেড়ে যাবে। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুইও তো কথাটা জানিস, তবু দাদির সঙ্গে কি এত কথা বলছিলি? এদিকে ড্রাইভার তানভীর চলে গেছে, সে খোঁজ রেখেছিস?

অঞ্জু কিছু বলার আগে জমিলা বেগম বললেন, তানভীর চলে গেছে আমরা জানি। সে কথাই এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। তারপর নাতনিকে বললেন, তুই নাস্তা খেয়ে অফিসে যা, বৌমাকে যা বলার আমি বলব।

অঞ্জু অফিসে চলে যাওয়ার পর জমিলা বেগম তানভীরের পরিচয় ও কেন সে চলে গেছে সবকিছু বললেন।

লুবাবা বেগম শুনে খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এসব জানলেন কি করে?

কি করে জেনেছেন বলে জমিলা বেগম বললেন, এখন কি করবে ভেবে দেখ।

তানভীরের বাবার কথা এত দিন আমাকে জানান নি কেন? অঞ্জুর বাবাও তো তার কথা কিছু জানাই নি।

তোমার শ্বশুর আমাদেরকে জানাতে নিষেধ করেছিল, তাই জানাই নি।

এখন কি করা যায় বলুন তো আম্মা? এদিকে আমার ভাই অঞ্জুকে বৌ করতে চায়। আমিও তাকে কথা দিয়েছি। ভাইয়া রাকেশকে কানাডা থেকে চলে আসতে বলেছে। আপনিও তো সেকথা জানেন?

হ্যাঁ, জানি। কিন্তু অঞ্জুর মতামত না নিয়ে ভাইকে কথা দেয়া তোমার উচিত হয়নি। সে তো আর বিয়ে করবে না বলেইছিল। যে কোনো কারণে হোক

তানভীরকে ভালবেসে ফেলেছে। আমার বিশ্বাস তানভীরকে ছাড়া অন্য কাউকেই বিয়ে করবে না।

তা হলে তো ভাইয়ার সঙ্গে আলাপ করতে হয়।

জমিলা বেগম চিন্তা করলেন, মোজাম্মেল এসব শুনেল তানভীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। এমন কি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টাও করবে। তাই বললেন, এখন মোজাম্মেলকে কিছু বলার দরকার নেই। এর মধ্যে যা কিছু করার আমরা করে ফেলব।

কি করে কিছু করবেন? তানভীর তো নিজের পরিচয় জেনেও চলে গেল।

চলে গেছে তো কি হয়েছে? তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। অঞ্জু তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই-ই তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে। আর এই বংশের একমাত্র বংশধর যাতে ফিরে আসে সে ব্যাপারে আমিও তাকে সাহায্য করব।

লুবাবা বেগম তানভীরকে উটকো ঝামেলা মনে করলেন। সে ফিরে এলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। এটা মেনে নিতে পারলেন না। ভেবেছিলেন, ভাইপো রাকেশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সবকিছুর কতৃত্ব করতে পারবেন। তানভীরের সঙ্গে বিয়ে দিলে তা হবে না। তা ছাড়া তানভীরের মা নিশ্চয় এখানে থাকবে। সব কিছুর কতৃত্ব তার হাতে চলে যাবে। না-না, তানভীরের সঙ্গে অঞ্জুর বিয়ে দেয়া চলবে না। এ ব্যাপারে ভাইয়ার সঙ্গে আলাপ করতেই হবে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জমিলা বেগম বললেন, কি ভাবছ জানি না, আমি কিন্তু রাকেশের সঙ্গে কিছুতেই অঞ্জুর বিয়ে দেব না। তানভীর চাকরির জন্য বায়োডাটায় লিখেছিল এইট পাশ। আসলে সে ইসলামিক হিস্ট্রিতে মাস্টার্স করেছে। আর তোমার ভাইপো রাকেশ শুধু বি. এ. পাশ। সব দিক দিয়ে তানভীর অঞ্জুর উপযুক্ত। তা ছাড়া ওরা একে অপরকে যখন ভালবাসে তখন তোমার কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

লুবাবা বেগম মনের কথা চেপে রেখে বললেন, আমি কি বলেছি তানভীরের সঙ্গে অঞ্জুর বিয়ে দেব না? আপনি যা চান তাই হবে। কথাটা মুখে বললেও মনে মনে ভাবলেন, প্রয়োজনে তানভীরকে তার বাবার প্রাপ্য সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে দেবেন। তবু তার সঙ্গে অঞ্জুর বিয়ে দেবেন না, অঞ্জুকে সব কিছু বুঝিয়ে রাকেশের সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

এবার যাই ওষুধ খেতে হবে বলে জমিলা বেগম চলে গেলেন।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এক ফাঁকে অঞ্জু দাদির রুমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মাকে সবকিছু বলেছেন?

জমিলা বেগম বললেন, হ্যাঁ বলেছি?

শুনে মা কি বলল?

তানভীরের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে রাজি হয়েছে। তবে তার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, তানভীরকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছে না। তোর মামার সঙ্গে এব্যাপারে আলাপ করতে চেয়েছিল। আমি নিষেধ করে বলেছি, তানভীরকে ফিরিয়ে আনার পর আলাপ করতে।

মাকে তো আমি চিনি, আপনার নিষেধ সত্ত্বেও আলাপ করবে।

করলে করবে। তাতে কিছু যায় আসে না। তুই দলিলটার ব্যাপারে কিছু চিন্তা করেছিস।

শুধু চিন্তা করিনি। কাজেও নেমেছি। বলছি শুনুন, মামার পিয়নকে পাঁচ হাজার দিয়ে বলেছি, ওনার নিজস্ব আলমারিতে একটা দলিল আছে। সেটা মামার অজান্তে যদি এনে দিতে পারিস, তা হলে আরো পাঁচ হাজার দেব।

পিয়ন ভয় পেয়ে বলল, কিন্তু দলিল না পেয়ে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, তা হলে কি বলব?

বলবি, আলমারির চাবি সব সময় আপনার কাছে থাকে, আমি কি করে বলব? "আপনি হয়তো ভুলে অন্য কোথাও রেখেছেন।"

রেগে গিয়ে উনি যদি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন?

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। উনি বরখাস্ত করলে, আমি তোমাকে চাকরি দেব। তবে ব্যাপারটা জীবনেও কাউকে বলবে না।

এখন বলুন, প্ল্যানটা কেমন?

প্ল্যানটা ভালো। কিন্তু চাবি যদি সব সময় তোর মামার কাছে থাকে, তা হলে পিয়ন দলিলটা নেবে কি করে?

সেটা পিয়নের ব্যাপার। টাকার লোভে যেমন করে হোক কাজটা করবে।

দলিল না পেয়ে যদি তোর মামা পিয়নকে মারধর করে অথবা টাকা চুরির মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাকে পুলিশে দেয়?

অঞ্জু হেসে উঠে বলল, তা করতে পারেন। তবে উনি যা কিছু করুন না কেন আমাকে না জানিয়ে করতে পারবেন না। জানার পর যা করার আমি করব। তবে আমার মনে হয় পিয়নকে রাগারাগি ছাড়া অন্য কিছু করবেন না। করলেই নিজেই যে ধরা পড়ে যাবেন, সে জ্ঞান মামার আছে।

জমিলা বেগম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোর এত বুদ্ধি, অথচ তানভীরকে ভুল বুঝে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলি।

ও আমার ভালবাসাকে অপমান করল কেন? ভাইতো রেগে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এবং তাকে ভুল বুঝে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি। সে জন্য আমি যে কত অনুতপ্ত, তা তো আপনি জানেন বলে অঞ্জু চোখ মুছল।

জমিলা বেগম বললেন, এই জন্য আল্লাহ রাগকে হারাম করেছেন। তা হ্যাঁরে, তুই যে বললি, তানভীরকে ফিরিয়ে আনবি, সে ব্যাপারে ভেবেছিস না কি?

আগে দলিলটা পেয়ে নিই, তারপর আমি ওদের গ্রামের বাড়িতে যাব।

তুই গেলেই তানভীর আসবে মনে করেছিস? আমার তো মনে হয় সে আসতে চাইলেও তার মা অনুমতি দেবে না।

যেমন করে হোক তার মায়ের অনুমতি আমি আদায় করব। আপনি শুধু দো'য়া করবেন। আল্লাহ যেন আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করেন।

তা তো সব সময় করি, আরো করব। কিন্তু তোকেও দো'য়া করতে হবে। কারণ, নিজের জন্য নিজে দো'য়া করতে হয়। এটা হাদিসের কথা। একবার বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সে সময় একদিন মাঠে বিরাট ওয়াজ মাহফিল হয়েছিল। মেয়েদের বসার জায়গা ছালার পর্দা দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। একজন মাওলানা ওয়াজে বললেন, আমাদের দেশে মৌলবীদের দাওয়াত দিয়ে মিলাদ পড়িয়ে মরহুম-মরহুমা মুরুব্বীদের জন্য দো'য়া করানো হয়। অনেকে আবার মসজিদের ইমাম সাহেবকে কিছু টাকা দিয়ে বলে আমি বা আমার স্ত্রী কুরআন খতম করেছে, আপনি আমাদের মৃত মা-বাবার নামে বখসে দেবেন। ইসলামে এসব বিধান নেই। তাই এটা বেদায়াত। জেনে নিন, যাদের রুহের মাগফেরাতের নিয়তে আপনি কুরআন খতম করবেন, খতম হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তার সওয়াব তাদের রুহে পৌছে দেবেন। তারপর আপনি নিজে কাকুতি মিনতি করে তাদের ও নিজের গুনাহ মাফের জন্য ও নেক হাজতের জন্য দো'য়া করবেন। তা না করে নিজে নামায রোযা করবেন না। নানারকম পাপ কাজ করবেন, আর বছরে একদিন মৌলবীদের দাওয়াত করে মিলাদ পড়িয়ে বা হাফেজদের দিয়ে কুরআন খতম করিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে আত্মীয়-স্বজনদের খাইয়ে ওনাদের দ্বারা দো'য়া করালে এতটুকু সওয়াবতো মরহুম মা বাবা ও মুরুব্বীদের রুহে পৌছাবে না, বরং এটা বেদায়াত হবে। ঐ সব না করে আপনারা নামায পড়ুন, রোযা রাখুন, সব রকমের পাপ কাজ থেকে দূরে থাকুন এবং নিজেরা যে যতটুকু পারেন, সূরা-কালাম ও দরুদ পড়ে মৃত মুরুব্বীদের মাগফেরাতের জন্য কেঁদে কেঁদে দো'য়া করুণ। এরকম করার দলিল ইসলামে আছে।

বিত্তবান লোকেরা গরিব আত্মীয়-অনাত্মীয় মেয়েদের, যাদের বাবারা আর্থিক কারণে বিয়ে দিতে পারছে না, তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করুণ। যে সব ছেলেমেয়ে বাবার আর্থিক দূরবস্থার কারণে লেখাপড়া করতে পারছে না, তাদের লেখাপড়া করার ব্যবস্থা করে দেন। আত্মীয় বা অনাত্মীয় গরিব কোনো ঋণগ্রস্থের ঋণ পরিশোধ করে দিন, আত্মীয় অনাত্মীয় কোনো বুড়ো বুড়ি, যাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, তাদের থাকা খাওয়া ব্যবস্থা করুণ, গ্রামের লোকজনের পানি কষ্ট দূর করার জন্য টিউবঅয়েল বসিয়ে দিন অথবা পুকুর কাটিয়ে দিন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিম খানায় দান করুন। এইসব করার সময় নিয়ত করবেন, আল্লাহ এসবের জাজা আমার মহরুম মা-বাবা ও মুরুব্বীদের রুহে পৌছে দিন। এইসব করার কথা হাদিসে আছে। হাদিসে আরো আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন- "দো'য়া (প্রার্থনা) হল ইবাদত। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন, আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি উত্তর দেব।"[১]

এবার আপনারাই বলুন; রসূলুল্লাহ (দঃ) দো'য়াকে ইবাদত বলিয়াছেন আর ইবাদত নিজেকে করতে হয়। নিজের ইবাদত অন্যকে দিয়ে কি করান যায়? আপনি ক্ষুধার্থ, অন্যকে খাওয়ালে কি আপনার ক্ষুধা মিটবে? মিটবে না। তাই দো'য়া নিজেকে করতে হবে। আর দো'য়া কবুল হওয়ার প্রধান দুটো শর্ত হল, হালাল খাওয়া ও মিথ্যে না বলা। হারাম রোজগার খেয়ে ও মিথ্যেবাদি হয়ে শুধু দো'য়া কেন, কোনো ইবাদতই (যেমন-নামায, রোযা, হজ, যাকাত, দান খয়রাত) কবুল হয় না।

তারপর অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে জমিলা বেগম বললেন, তোকে কতবার নামায পড়ার কথা বলি, পড়িস না কেন? মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে অনুসরণ করে। তুই তানভীরকে ভালবাসিস, সে নামায পড়ে তুই পড়িস না কেন? তানভীরের গ্রামের বাড়িতে যাবি, গ্রামের মেয়েরা ধার্মিক বেশি। তানভীরের মা যখন জানবে নামায পড়িস না তখন কি মনে করবে? বোরখা পরে বাইরে যাস, এটা খুব ভালো। আল্লাহ মেয়েদের বাইরে বেরোবার সময় পর্দার করতে বলেছেন। তিনি কুরআনপাকে অসংখ্য বার নামায কায়েম করার কথা বলেছেন। তাই প্রত্যেকে মুসলমান নর-নারীর নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য। ঐ ওয়াজ মাহফিলে একজন মৌলবী বলেছিলেন, মানুষ তিনটি জিনিস- শরীর, প্রাণ বা জবনীশক্তি ও আত্মা দ্বারা গঠিত। মৃত্যু শরীর ও প্রাণকে নিঃশেষ করে দেয়।

(১) বর্ণনায়- হযরত নোমান (রাঃ) তিরমিযী

আত্মা অমর ও অক্ষয়। এই আত্মাই প্রকৃত মানুষ। শরীর ও প্রাণের খোরাক খাদ্য। আত্মার খোরাক নামায ও অন্যান্য ইবাদতের পূন্য। খাদ্যের অভাবে যেমন শরীর ও প্রাণ ধংস হয়। পূন্যের অভাবে তেমনি আত্মার অবনতি ঘটে। নামায মানুষের সৃষ্টির সার্থকতা রক্ষা করে, নিয়মানুবর্তীতা শিক্ষা দেয়, দেহ, মন ও আত্মার পবিত্রতা আনায়ন করে, সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব ভাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করে। একই নেতার অনুসরণ শিক্ষা দেয়। সময়ের মুল্যবোধ জাগিয়ে দেয়। পাপী ও ধার্মীকের পরিচয় দান করে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে। কুরআনকে জীবিত রাখে। নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও অসৎকে দূর করে। নামাযই ইসলামের প্রধান স্তম্ব।

যে নামায মানুষকে এত কিছু শিক্ষা দেয়, সেই নামাযকে তুচ্ছ মনে করে আজ মুসলমানরা অবহেলা করে পড়ে না। এটা যে কত বড় আফসোষের কথা, তা কয়জন চিন্তা করে?

অঞ্জু বলল, ঠিক আছে, আমি আজ থেকেই নামায পড়ব।

জমিলা বেগম আলহমদুলিল্লাহ বলে বললেন, শুনে খুশী হলাম।

শ্বাশুড়ীর নিষেধ সত্ত্বেও লুবাবা বেগম রাত বারটার সময় ভাইয়াকে ফোন করে তানভীরের পরিচয় ও শ্বাশুড়ীর মতামতের কথা জানালেন।

মোজাম্মেল সাহেব আজ অফিসে অঞ্জুর কাছে তানভীরের চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন। এখন তার পরিচয় ও জমিলা বেগমের মতামতের কথা শুনে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, তানভীর বাবার সম্পত্তির অর্ধেক অংশীদার। অঞ্জুর সঙ্গে বিয়ে হলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তার আশা পূরণ হবে না ভেবে খুব রেগে গেলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন তানভীরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

ভাইয়াকে এতক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে লুবাবা বেগম অধৈর্য গলায় বললেন, তুমি কিছু বলছ না কেন ভাইয়া?

বোনের কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, তানভীর কোথায় থাকে জানিস?

না।

জানার চেষ্টা কর।

তা না হয় করব; কিন্তু এখন কি হবে বলবে তো। আমার শ্বাশুড়ী বললেন, অঞ্জু তানভীরকে ভালবাসে, বিয়ে করলে তাকেই করবে, রাকেশকে করবে না।

তুই ওসব নিয়ে চিন্তা করিস না। তানভীরকে দুনিয়া থেকে সরাতে পারলে অঞ্জুকে ম্যানেজ করতে অসুবিধা হবে না। আর শোন, বাড়ির ও ব্যবসার দলিলগুলো আমার দরকার। সেগুলো কোথায় আছে জানিস?

হ্যাঁ, জানি। ওগুলো আমার শাশুড়ীর স্টীলের আলমারিতে আছে।

ওগুলো যেমন করে হোক হস্তগত করবি।

লুবাবা বেগম ভাইপোকে জামাই করে সবকিছুর কতৃত্ব করতে চাইলেও সম্পত্তি বেহাত করতে চান না। তাই ভাইয়ার মতলব বুঝতে পেরে ভয়ার্তস্বরে করলেন, ওগুলো তোমার কি দরকার?

চিন্তা করিস না, ওগুলো একটু দেখব, তারপর ফেরত দিয়ে দেব।

ঠিক আছে, ওগুলো নেয়ার চেষ্টা করব।

শুধু চেষ্টা করলে হবে না, যেমন করে হোক ওগুলো নিয়ে আমাকে দিবি। আর শোন, তানভীর যদি ফিরে আসে আমাকে জানাবি।

ঠিক আছে, জানাব। এবার রাখি তা হলে?

রাখ বলে মোজাম্মেল সাহেব রিসিভার ক্র্যাডেলে রেখে চিন্তা করতে লাগলেন কি ভাবে তানভীরকে দুনিয়া থেকে সরাবেন।

অফিসে অঞ্জু ও তার মামা মোজাম্মেল সাহেবের রুম পাশাপাশি। পিয়ন হাবিব সব সময় রুমের বাইরে মাঝামাঝি জায়গায় টুলে বসে থাকে। পিয়নকে ডাকার জন্য দুটো রুমেই কলিং বেল আছে।

হাবিব যতক্ষণ টুলে বসে থাকে ততক্ষণ চিন্তা করে কি করে ম্যানেজার সাহেবের আলমারি থেকে দলিলটা বের করবে।

প্রায় আট-দশ দিন পর ম্যানেজারকে রুম থেকে বেরুতো দেখে হাবিব দাঁড়িয়ে সালাম দিল।

মোজাম্মেল সাহেব সালামের উত্তর না দিয়ে শুধু একটু মাথা নেড়ে বললেন, আমি বাইরে যাচ্ছি, কেউ আমার খোঁজ করলে বলবে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরব। কথা শেষ করে লিফটের দিকে এগোলেন।

উনি লিফটে ঢোকার পর যখন গেট বন্ধ হয়ে গেল তখন হাবিব ওনার রুমে ঢুকে টেবিলের ড্রয়ারের কী হোলে চাবির গোছা ঝুলছে দেখে মুখে হাসি খেলে

গেল। অঞ্জু দলিলের কথা বলার পর থেকে ম্যানেজার সাহেব যে দিন বাইরে কোথাও যান, সেদিন রুমে ঢুকে প্রথমে টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেখে খোলা আছে কিনা। প্রতিদিনই লক করা থাকে। আজ চাবি দেখে তাড়াতাড়ি চাবির গোছাটা নিয়ে ম্যানেজার সাহেবের আলমারি থেকে দলিলের ফাইলটা নিল। তারপর আলমারি বন্ধ করে চাবির গোছাটা টেবিল ড্রয়ারের কী হোলে ঝুলিয়ে রেখে অঞ্জুর রুমে গিয়ে ফাইলটা দিয়ে বলল, দেখুন তো এটা কিনা?

অঞ্জু ফাইল খুলে দেখল, দলিলের সঙ্গে আরো অনেক কাজগপত্র রয়েছে। দলিলটা বের করে নিয়ে ফাইলটা হাবিবের হাতে দিয়ে বলল, যেখানে ছিল সেখানে রেখে দেবে। মনে হয় মামা চাবি ফেলে রেখে গেছেন, সেই সুযোগে কাজটা করেছ, তাই না?

জি।

ঠিক আছে, তুমি এখন যাও, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।

পিয়ন চলে যাওয়ার পর অঞ্জু দলিলটা পড়ে বুঝতে পারল, তানভীরের কথা ঠিক। বাবার সিগনেচার যে জাল, তাও বুঝতে পারল। দলিল ব্রিফকেসের ভিতরে রেখে চিন্তা করল, যত শিঘ্রী সম্ভব তানভীরকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাসায় ফিরে অঞ্জু ভেবে রাখল, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর দলিলটা দেখাবার জন্য দাদির রুমে যাবে। দাদি যে দিন কুরআন হাদিস ও নামায পড়ার কথা বলেছিলেন, তার পরের দিন কয়েকটা হাদিসের বই ও কুরআনের তাফসীর কিনে এনে পড়তে শুরু করে এবং নামায পড়তেও শুরু করে।

রাত দশটায় সবাই একসঙ্গে খায়। আজ খাওয়ার পর অঞ্জু প্রতিদিনের মতো একটা হাদিসের বই পড়ছিল। কিছুক্ষণ পর দরজার বাইরে মায়ের গলা পেল, "অঞ্জু ঘুমিয়ে গেছিস নাকি?"

অঞ্জু হাসিদটা বন্ধ করে বলল, এস মা, ঘুমাই নি।

লুবাবা বেগম ভিতরে এসে বসে বললেন, তোকে কয়েকটা কথা বলতে এলাম।

বেশ তো, বল কি বলবে।

তোকে যে একদিন রাকেশের কথা বলে মতামত জানাতে বলেছিলাম, কই, কিছু বললি না তো?

তোমাকে তো সেদিনই বলেছিলাম, রাকেশকে আমার পছন্দ নয়, তবু জিজ্ঞেস করছ কেন?

তোর দাদির কাছে শুনলাম, তুই তানভীরকে নাকি পছন্দ করিস?

অঞ্জু সরাসরি হ্যাঁ বলতে না পেরে বলল, দাদি ঠিক কথা বলেছেন।

তানভীর তোর চাচাতো ভাই, ছেলে হিসাবেও ভালো; কিন্তু সে পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, আমাদের সোসাইটি সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই। তা ছাড়া তার সঙ্গে অনেক বছর আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তোদের দাম্পত্য জীবন কি সুখের হবে? তার চেয়ে রাকেশ সব দিক থেকে আমাদের জামাই হওয়ার উপযুক্ত। তুই সুখী হবি।

তোমার সব কথা ঠিক; কিন্তু তুমি তো জান কি না জানি না, মামা রাকেশের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে আমাদের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতে চান। আমার ধারণা কি জান মা, মামা রাকেশের সঙ্গে যোগসাজ করে আমাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

লুবাবা বেগমের তখন ভাইয়ার টেলিফোনে দলিলের ব্যাপারে আলাপ মনে পড়ল। চিন্তা করলেন, অঞ্জুর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে তো তানভীরের সঙ্গেই অঞ্জুর বিয়ে হওয়া উচিত।

মাকে চুপ করে থাকতে দেখে অঞ্জু বলল, কিছু বলছ না কেন?

তুই একথা জানলি কি করে?

তানভীর চলে যাওয়ার আগে আমাকে একটা চিঠি লিখে টেবিলের উপর রেখে যায়। তার চিঠি পড়ে জানতে পারি। আরো জানতে পারি, বাবা নাকি মামাকে আমাদের দেখাশোনা করার জন্য গার্জেন করে সমস্ত সম্পত্তি ওনার নামে দলিল করে দিয়েছেন। দলিলটা যে জাল এবং দলিলটা অফিসে মামার নিজস্ব স্টীলের আলমারিতে আছে তাও চিঠিতে লিখেছে।

লুবাবা বেগম অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই।

কিন্ত ভাইয়া এরকম কাজ করবে বিশ্বাস করতে পারছি না।

অঞ্জু ব্রিফকেস থেকে দলিলটা বের করে মায়ের হাতে দেয়ার সময় বলল, এটা পড়, তা হলে বিশ্বাস হবে। আমি অফিসে মামার আলমারি থেকে কৌশলে হস্তগত করেছি।

লুবাবা বেগম পড়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, নিজের মায়ের পেটের বড় ভাই হয়ে এরকম করবে ভাবতেই পারছি না। তানভীর যদি তোকে চিঠিতে একথা না জানাত, তা হলে কি হত আল্লাহকে মালুম। তারপর বাড়ির ও ব্যবসার দলিলের ব্যাপারে ভাইয়ার সঙ্গে যা আলাপ হয়েছে বললেন।

অঞ্জু বলল, খবরদার, তুমি মামাকে দলিল দেবে না। জিজ্ঞেস করলে বলবে, চেষ্টা করেও নেয়ার সুযোগ পাচ্ছ না।

এব্যাপারে তুই কি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিস?

না। আগে তানভীরকে বিয়ে করব। তারপর যা করার তানভীরই করবে।

কিন্তু তোর মামা বিয়েতে বাধা দেবে তো।

জমিলা বেগম নাতনির সঙ্গে আলাপ করার জন্য তার রুমের দরজার কাছে এসে বৌমার গলা পেয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ তাদের সবকিছু শুনছিলেন। এবার রুমে ঢুকে বললেন, বৌমা তোমার ভাইয়াকে আমরা কেউ চিনতে পারি নি। আমাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কুমতলব এঁটেছিল। তানভীর না চিনিয়ে দিলে আমরা তাকে চিনতে পারতাম না। অঞ্জু ঠিক কথা বলেছে, প্রথমে ওদের বিয়েটা মিটিয়ে ফেলতে হবে তারপর তানভীর তার বাপ-দাদার সম্পত্তি কিভাবে রক্ষা করবে সে চিন্তা তার। আর তোমার ভাইয়ার বাধা দেয়ার কথা যে বললে, তার সুযোগই সে পাবে না।

কিন্তু তানভীরকে আমরা পাচ্ছি কোথায় যে, অঞ্জুর সঙ্গে বিয়ে দেব?

সে ব্যাপারে আমি চিন্তা করে ঠিক করে রেখেছি।

কি চিন্তা করেছেন।

সে কথা এখন জানাব না। যখন ওদের বিয়ে হবে তখন নিজেই জানতে পারবে। এবার তুমি যাও, অঞ্জুর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে।

আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?

হ্যাঁ, কারণ তানভীরের ব্যাপারটা তোমার ভাইকে জানাতে নিষেধ করেছিলাম। তবু রাত বারটার সময় ফোন করে জানিয়েছ।

লুবাবা বেগম শাশুড়ীর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, অঞ্জুর ভালো-মন্দ চিন্তা করে আপনার নিধেষ সত্ত্বেও ভাইয়াকে ফোন করে জানিয়েছিলাম। তা ছাড়া তখন আমি ভাইয়ার কুমতলবের কথা জানতমা না; আমাকে মাফ করে দিন মা। আর কখনও আপনার কথা অমান্য করব না।

জমিলা বেগম বৌ-এর মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করুক। তারপর তাকে পাশে বসিয়ে বললেন, কয়েকদিনের মধ্যে আমরা রংপুরে তোমার বড় বোনের বাসায় যাব। ওদের বিয়ের ব্যাপারে যা করার ওখানে থেকেই করব। যাওয়ার দিন সকালে তুমি মোজাম্মেলকে ফোন করে বলবে, "রাতে রংপুর থেকে তোমার ভাগনা ফোন করে জানিয়েছে, তার মা মৃত্যু শয্যায়। অঞ্জুকে ও তোমাকে দেখতে চাচ্ছেন। তাই অঞ্জু আজ অফিসে যাবে না। ওকে নিয়ে আমি রংপুর যাচ্ছি। আমার শাশুড়ীও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। ওখানে যে ক'দিন থাকব, সে ক'দিন তুমি ভাবিকে নিয়ে আমাদের

বাসায় থাকবে।" মোজাম্মেলকে ফোন করার আগে রংপুরে তোমার বোনকে ফোন করে জানাবে আমরা সন্ধ্যের দিকে আসছি।

কয়েক দিনের মধ্যে প্ল্যান মতো সবকিছু করে বেলা ন'টায় গাড়ি নিয়ে রওনা দিয়ে বিকেল পাঁচটায় রংপুরে পৌছে গেল।

জমিলা বেগম কখনও আসেন নি। ওনাকে পেয়ে লুবাবা বেগমের বোন মাহফুজা ও দুলাভাই আমজাদ এবং তাদের ছেলে মেয়েরা খুব খুশী।

রাতে খাওয়ার পর জমিলা বেগম মাহফুজা ও আমজাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর বললেন, আমরা এসেছি অঞ্জুর বিয়ে দিতে। পাত্র বগুড়া জেলার ধুবচাচিয়ার। তারপর সংক্ষেপে তানভীরের পরিচয় ও কিভাবে তানভীরের পরিচয় পেল এবং তার সঙ্গে অঞ্জুর সম্পর্ক ও তার গ্রামে চলে আসার কথা বলে বললেন, তানভীর অঞ্জুকে ভালবাসলেও তার মায়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে না। আর তার মা যে অঞ্জুকে কিছুতেই বৌ করবে না, তা সে জানে। তাই গ্রামে চলে এসেছে। আমি চাচ্ছি, আমরা ধুবচাচিয়া গিয়ে তানভীরের মাকে রাজি করিয়ে ওখানেই বিয়ের কাজ সারতে। তারপর তানভীর ও তার মাকে নিয়ে ঢাকায় ফিরব। আমরা ধুবচাচিয়া চিনি না। তাই তোমাদের যে ছেলে আমাদের ধুবচাচিয়া পৌছে দিতে পারবে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

মাহফুজা সবকিছু শুনে খুব অবাক হয়ে বলল, আমরা জানতাম, অঞ্জুর বাবার কোনো ভাই নেই। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, আফসারকে পাঠালে কেমন হয়?

আমজাদ বলল, হ্যাঁ, ও একবার ধুবচাচিয়া কি জন্যে যেন গিয়েছিল। তারপর জমিলা বেগমকে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কবে যেতে চান?

কালই যেতে চাই।

না-না, কাল যেতে দেব না। আপনি কখনও আসেন নি, কয়েকদিন থাকুন, তারপর যাবেন।

জমিলা বেগম বললেন, যে কাজে এসেছি তা সমাধান না করে এখানে থাকলে শান্তি পাব না। ঠিক আছে, পরশু না হয় আমরা ধুবচাচিয়া রওয়ানা দেব। তবে কাল সকালে আফসার শুধু অঞ্জুকে ধুবচাচিয়া পৌছে দিয়ে ফিরে আসবে।

আমজাদ বলল, কাজটা কি ঠিক হবে?

সবার কাছে বেঠিক হলেও আমার কাছে ঠিক। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।

পরের দিন সকালে নাস্তা খেয়ে আফসার অঞ্জুকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। অঞ্জু আর আফসার প্রায় সমবয়সী। এক বছরের ছোট অঞ্জু। দু'জনেই তুই-তোকারি করে। আফসার গাড়ি চালাতে চালাতে একসময় বলল, তোদের ঘটনা শোনার সময় মনে হল, টি. ভি. পর্দায় নাটক দেখছি।

অঞ্জু হেসে উঠে বলল, যখন দাদির মুখে তানভীরের পরিচয় পেলাম তখন আমারও তাই মনে হয়েছিল।

তুই কিন্তু খুব বড় রিস্ক নিচ্ছিস।

তা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ঐ যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে, "নো রিস্ক নো গেন।"

তোর কথা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছি, তোর পরিচয় পেয়ে তানভীরের মা না তাড়িয়ে দেয়।

তানভীরকে যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে, যে মা তার মতো সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তিনি কখনই এমন কাজ করতে পারেন না।

কি জানি, আমার তো কেমন ভয় করছে। তোকে রেখে ফিরে আসতে মন চাইছে না।

মন না চাইলে থাকবি।

তা সম্ভব নয়। খালা আম্মা ও দাদির হুকুম তোকে রেখে ফিরে আসতে হবে।

তা হলে আমার জন্য এতটুকু চিন্তা করবি না। তারপর বলল, তুই ছেলে, ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি মেয়ে, কই, আমার তো এতটুকুও ভয় করছে না?

তোর কথা শুনেও মন থেকে ভয়টা যাচ্ছে না। একটা কথা বলি শোন, ওখানকার একটা ছেলে আমার বন্ধু। ওদের বাড়িতে একবার গেছি। তার সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেব। তানভীরের মা যদি তোকে তাড়িয়ে দেন, তা হলে ওদের বাড়িতে এসে থাকবি। ওদের ফোন আছে। ফোন করে আমাদের জানাতে পারবি। আর তুই যদি বলিস, তা হলে, তানভীরের বাড়িতে তোকে পৌঁছে দিয়ে বন্ধুর বাড়িতে আমি থেকে যাব। গোপনে মাকে আমি সে কথা বলে এসেছি।

অঞ্জু আবার হেসে উঠে বলল, ছেলেরা যে এত ভীতু হয় জানতাম না। তুই যে কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিস, আল্লাহর রহমতে ওসব কিছু হবে না। তানভীরের মা যদি তাড়িয়েও দেন, তানভীর আমার ব্যবস্থা করবে।

ও বুঝি তোকে খুব ভালবাসে?

ওর ভালবাসার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তা ছাড়া ওর হৃদয় সাগরের মতো বিশাল। সেখানে নেই কোনো লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, আছে শুধু সাগরের সীমাহীন জলরাশির মতো ভালবাসা।

আরে বাব্বা, তুই যে দেখছি তানভীরের ভালবাসার সাগরে সাঁতার কাঁটতে কাঁটতে কবি হয়ে গেছিস।

আমার কথা রেখে এবার তোর কথা বল।

আমার কথা আবার কি বলব?

এই ধর, কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম হয়েছে কি না।

হ্যাঁ, দু'টোই হয়েছে।

দু'টোই হয়েছে মানে?

তুই-ই তো প্রেম-ট্রেম বললি। প্রেম আর ট্রেম দু'টো আলাদা শব্দ নয়?

তুই কিন্তু ফাজলামী করছিস।

এই কথায় ফাজলামী করলাম কোথায়? প্রেম হয়েছিল একটা মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু এক বিলেত ফেরত ডাক্তার তাকে বিয়ে করে ফেলল। তাই মনের দুঃখে ঐ ঘটনাকে আমি ট্রেম বলি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মা বাবার সিলেক্ট করা মেয়েকে বিয়ে করে তার সঙ্গে প্রেম করব।

অঞ্জু তার কথা শুনে হেসে ফেলে বলল, তোর বয়স কত হল রে?

ত্রিশ।

প্রেম না হয় না করলি, বিয়ে তো করবি। এমন নয় যে, বৌয়ের খরচ যোগাতে পারবি না। তুইতো ভালো বেতনের চাকরি করিস।

বললাম না, মা বাবার সিলেক্ট করা মেয়েকে বিয়ে করব।

তা হলে খালাকে বলব তোর জন্য মেয়ে দেখতে।

বলা লাগবে না, বাবা তার মামাত ভাইয়ের মেয়েকে সিলেক্ট করে রেখেছে। মেয়ের সামনে বি. এ. পরীক্ষা। পরীক্ষার পর বিয়ে হবে।

সে কথা আগে বললেই পারতিস। মেয়েকে দেখেছিস নিশ্চয়?

কেন দেখব না; আমাদের বাড়িতে বছরে দু'একবার বেড়াতে আসে।

দেখতে নিশ্চয় ভালো?

শুধু ভালো নয়, রূপে গুণে অতুলনীয়া।

ফাজলামী করবি না। সত্যি করে বলতো মেয়ে তোর পছন্দ কি না।

রূপে গুণে অতুলনীয়া মেয়েকে কার না পছন্দ হবে?

আবার ফাজলামী করছিস?

ফাজলামী নয়, সত্যি বলছি।

ঠিক আছে, বিয়ের সময় দেখব তোর বৌ কতটা অতুলনীয়া।

তাই দেখিস। এখন চুপ কর। আজ তুই বড় বেশি বকবক করছিস।

আমি একা বকবক করছি? তুই করিস নি? ঠিক আছে, এই চুপ করলাম। পৌঁছানো পর্যন্ত একটা কথাও বলব না।

ধুবচাচিয়া পৌঁছাতে দুটো বেজে গেল। আফসার বলল, এ সময় কারো বাড়িতে না খেয়ে যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সে নিশ্চয় তানভীরদের বাড়ি চেনে।

অঞ্জু বলল, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে না। তানভীরের বাবা এখানকার হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। স্কুলে গিয়ে হেড মাস্টারের কাছে জানা যাবে। তার আগে হোটেলে খেয়ে নেয়াই ভালো।

বাহ! তোর ব্রেন খুব সার্প। এ সামান্য কথাটাও আমার মাথায় আসে নি।

গাড়িতে বসে বকবক না করে হোটেলে চল, ক্ষিধে পেয়েছে।

মফস্বল টাউন। ভালো কোনো হোটেল নেই। তবু ওরই মধ্যে দেখে শুনে একটা হোটেলে খেল। বিল পেমেন্ট করার সময় ম্যানেজারের কাছে হাই স্কুলের লোকেশান জেনে যখন স্কুলে পৌঁছাল তখন তিনটে বেজে গেছে।

তানভীর টিসার্স রুম থেকে বেরিয়ে ক্লাস নিতে যাচ্ছিল। স্কুল কম্পাউণ্ডে অঞ্জুর গাড়ি দেখে চমকে উঠে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

অঞ্জু গাড়ি থেকে নেমে তানভীরকে দেখতে পেয়ে আফসারকে বলল, ঐ তো তানভীর। তারপর এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছ?

তানভীর শুধু সালামের উত্তর দিয়ে আফসারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

আফসারও সালাম দিয়ে বলল, আমি অঞ্জুর খালাত ভাই আফসার। বাড়ি রংপুর।

আপনারা একটু অপেক্ষা করুন বলে তানভীর হেড মাস্টারের রুমে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে আফসারকে বলল, গাড়ি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাবে না। এখানেই থাক। আপনি সব কাচ তুলে দিয়ে লক করে দিন।

অঞ্জু লক্ষ্য করল, তাকে দেখে তানভীরের মুখে আনন্দ ফুটে উঠলেও এখন একটু গম্ভীর।

আফসার তানভীরকে জিজ্ঞেস করল, এখান থেকে আপনাদের বাড়ি কত দূর?

দশ মিনিটের পথ। হেঁটে যেতে আপনাদের একটু কষ্ট হবে।

আপনি কি মনে করবেন জানি না, আমি আপনাদের বাড়িতে যেতে পারব না। এক্ষুনি আমাকে ফিরতে হবে।

তানভীর বেশ অবাক হয়ে বলল, কেন, আমাদের বাড়িতে না যাওয়ার কোনো কারণ আছে নাকি?

না, কোনো কারণ নেই। আমার ডিউটি ছিল, অঞ্জুকে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া। এখানে যখন আপনাকে পেয়ে গেলাম তখন আর বাড়িতে গিয়ে কি হবে? পেটে ক্ষিধে থাকলে যেতাম। ধুবচাচিয়া পৌঁছেই হোটেলে ক্ষিধে মিটিয়েছি। আপনাদের বাড়িতে গেলে কমপক্ষে এক ঘন্টা লেট হবে। তারপর ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। আল্লাহ রাজি থাকলে আবার আসব। প্লীজ কিছু মনে নেবেন না। ছোট ভাই মনে করে ক্ষমা করে দেবেন।

ক্ষমা চাইছেন কেন? সুবিধা-অসুবিধা সবারই থাকে। আমি আর আপনাকে জোর করব না।

থ্যাঙ্ক ইউ ব্রাদার বলে আফসার গাড়িতে উঠে বলল, চলিরে অঞ্জু। তারপর তানভীরের সঙ্গে সালাম বিনিময় করে গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ অঞ্জু সেদিকে তাকিয়ে রইল। অদৃশ্য হয়ে যেতে তানভীর ও তার মা তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে ভেবে বেশ ভয় পেল। মুখ নিচু করে তানভীর কি বলে অপেক্ষা করতে লাগল।

তানভীর তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, চল, আমরা যাই।

তানভীর তাকে তুমি করে বলতে অঞ্জুর ভয় একটু কমল। কিছু না বলে তার সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

তানভীল জিজ্ঞেস করল, কবে এসেছ?

গতকাল।

একাই?

মা ও দাদি এসেছেন।

ওনারা এখানে এলেন না কেন?

কাল পরশু আসবেন।

তুমি তা হলে সারজমিন করার জন্য আগে এসেছ, ওনারা এসে ফাইন্যাল করবেন, তাই না?

ঢাকা থেকে আমি একাই আসছিলাম, সে কথা জেনে ওনারা এসেছেন।

এসেছ কেন?

ভালবাসার গোলাপ নিতে।

গোলাপ গাছে কাঁটা থাকে। নিতে গেলে কাঁটা বিঁধে যায়।

সে কথা জেনেই এসেছি। তারপর তার পথরোধ করে ছলছল চোখে অঞ্জু বলল, সেদিন তোমাকে অপমান করে উপরে এসে অনুতপ্ত হয়ে কাঁদছিলাম।

দাদি এসে তোমার আসল পরিচয় জানাতে সেই আগুনে ঘা ঢালার মতে হয়েছে। ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত সে আগুন নিভবে না। বল ক্ষমা করে দিয়েছ?

এটা গ্রাম। রাস্তার লোকজন আমাদেরকে দেখছে। তোমার চোখে পানি দেখলে তারা অনেক কিছু ভাববে। চোখ মুছে মুখে নেকাব দাও। তারপর যেতে যেতে বলল, সেদিনের ব্যবহারে আমি কিছু মনে করি নি। অন্য পাঁচটা মেয়ে যা করত সেটাই তুমি করেছ।

তবু বল, ক্ষমা করেছ?

ক্ষমা না করলে তোমার খালাত ভাইয়ের সঙ্গে ফিরে যেতে হত। এখন যা বলছি শোন, ঘরে গিয়ে আমাদেরকে মায়ের কাছে খুব কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। ভালো রেজাল্ট করার মানসিক প্রস্তুতি নাও।

প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি, তুমি প্রস্তুতি নিয়েছ?

জানতাম তুমি আসবে, তাই আগেই নিয়ে রেখেছি।

ঘরে পৌঁছে তানভীর মায়ের রুমের দরজার বাইরে থেকে মা বলে ডাকল।

আসমা খাতুন দিনের বেলা ঘুমান না। বিছানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। আজ বিশ্রাম নেয়ার সময় চিন্তা করছিলেন, এবার তানভীরের বিয়ে দিতে হবে। বয়স তো আর কম হল না? এমন সময় তার মা ডাক শুনে বললেন, আয়, ভিতরে আয়।

তানভীর অঞ্জুকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে বলল, ঢাকায় এই মহিলার গাড়ির ড্রাইভারীর চাকরি করতাম। চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি বলে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। সে ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

অঞ্জুকে বোরখাপরা দেখে আসমা খাতুন মনে করলেন বয়স্ক মহিলা। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললেন, তুই বাইরে যা, আমি ওনার সঙ্গে আলাপ করি। তানভীর বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, আপনি বসুন।

অঞ্জু বোরখা খুলে চেয়ারে রেখে প্রথমে আসমা খাতুনের পায়ে হাত ছুঁয়ে সালাম করল, তারপর ওনাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বোরখা খুলতে পঁচিশ-ছাব্বিষ বছরের অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দেখে আসমা খাতুন অবাক হয়েছেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখে আরো অবাক হয়ে বললেন, কাঁদছ কেন? তানভীর কি আপনাকে অপমান করেছে?

অঞ্জু ঐ অবস্থায় ভিজে গলায় বলল, তার থেকে আরো বড় অন্যায় করেছে।

আসমা খাতুন গম্ভীরস্বরে বললেন, আমার ছেলে বড় কিছু অন্যায় করা তো দূরের কথা, এতটুকু অন্যায়ও করতে পারে না। তবু তোমাকে বলার অনুমতি দিলাম।

অঞ্জু ওনাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ মুখ মুছে পাশে বসে বলল, আমি তো আপনার মেয়ের বয়সী, তুমি করে বলুন।

ঠিক আছে, এবার বল তানভীর কি করেছে।

আমরা একে অপরকে ভীষণ ভালবাসি। আমি বিয়ে করার কথা বলতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। তা ছাড়া আমার মামা চক্রান্ত করে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চান। আমরা সে কথা জানতাম না। আপনার ছেলে জেনেও কোনো প্রতিকার না করে শুধু আমাদেরকে একটা চিঠিতে সে কথা লিখে রেখে চলে এসেছে। এবার আপনিই বলুন এগুলো তার অন্যায় কিনা?

আসমা খাতুন অঞ্জুকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছেন। তারপর তার অভিযোগ শুনে বুঝতে পারলেন, মেয়েটি সত্যিই তানভীরকে ভালবাসে।

জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি?

আঞ্জুমানারা বেগম। ডাক নাম অঞ্জু।

মা বাবা আছেন?

মা আছেন, বাবা চার বছর হতে চলল মারা গেছেন।

তুমি পড়াশোনা কর?

জিনা, বাবা বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর আমি ব্যবসা দেখাশোনা করছি।

তোমার কোনো ভাই নেই?

না, ভাই বা বোন কেউ নেই, আমি একা।

কতদূর লেখাপড়া করেছ?

যে বছর মাস্টার্স কমপ্লিট করি, সেই বছর বাবা মারা যান।

তা হলে তো তোমরা খুব বড়লোক। একজন ড্রাইভারকে ভালবাসতে তোমার বিবেকে বাধল না।

মাফ করবেন, সে কথা বলতে পারব না। তবে এতটুকু বলতে পারি, আপনার ছেলের সবকিছু আমার ভালো লাগে। তার মধ্যে এমন কিছু আছে, যে মেয়ে একবার তার সঙ্গে পরিচিত হবে, সেই ভাল না বেসে থাকতে পারবে না।

তোমার মা বা অন্য কোনো গার্জেন তোমাদের সম্পর্কের কথা জানেন?

মা ও দাদি আছেন। ওনারা আপনার ছেলেকে ভীষণ পছন্দ করেন। আর মামা গার্জেন হলেও ওনার দুষ্কর্মের কথা তো একটু আগে বললাম।

তুমি যে এসেছ, ওনারা জানেন?

আপনার ছেলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করলাম তার ফায়সালা আগে করুন, নচেৎ আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না।

আর তোমার অভিযোগ যদি তানভীর অস্বীকার করে, তা হলে?

তা হলে আপনি যে শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব।

আসমা খাতুন ছেলের নাম ধরে ডেকে বললেন, এখানে আয়।

তানভীর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সবকিছু শুনছিল। মা ডাকতে ভিতরে এল।

আসমা খাতুন বললেন, মনে হয় আমাদের কথাবার্তা তুই সব শুনেছিস?

হ্যাঁ, শুনেছি।

তা হলে বল, তোর বিরুদ্ধে অঞ্জু যে অভিযোগ করেছে, তা সত্য না মিথ্যে?

সত্য। তবে বিয়ে করার কথা শুনে চাকরি ছেড়ে চলে আসিনি, অন্য করণে এসেছি।

আসমা খাতুন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অঞ্জুর দিকে তাকালেন।

এতক্ষণ অঞ্জু চটপট কথা বললেও আসমা খাতুনের চোখে চোখ পড়তে ভয় পেয়ে মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আসমা খাতুন বললেন, তোমার অভিযোগ সত্য হলেও চলে আসার কারণ তানভীর যা বলল, তা স্বীকার কর?

জি।

কারণটা নিশ্চয় তুমি জান?

জি, তখন আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। তাই এমন কিছু খারাপ ব্যবহার করেছিলাম, যে কারণে ও চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। তবে পরে ভুল বুঝতে পেরে খুব অনুতপ্ত হয়ে ওর কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে দেখি চলে গেছে। অবশ্য এখানে এসেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।

তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে কেন? তানভীর কি এমন অন্যায় করেছিল?

কোনো অন্যায় করে নি। বিয়ের কথা শুনে এমন কিছু কথা বলে অপরাগতা প্রকাশ করে, যা শুনে আমি খুব রেগে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

কি বলেছিল বলতো শুনি।

অঞ্জু কিছু বলার আগে তানভীর বলল, মা, এতটা পথ জার্নি করে এসে ও ক্লান্ত। ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।

তা হলে তুই বল, সে দিন ওকে কি বলেছিলি।

বলব, তার আগে ওয়াদা কর ওকে ফিরিয়ে দেবে না।

অঞ্জুর প্রতি ছেলের গভীর ভালবাসার কথা বুঝতে পেরে আসমা খাতুন মৃদু হেসে বললেন, তুই যে মেয়েকে ভালবাসিস, যে মেয়ে ভালবাসার টানে প্রায়

দু'তিনশ মাইল দূর থেকে তোর কাছে এসেছে, মা হয়ে তাকে ফিরিয়ে দেব ভাবলি কি করে?

তবুও তোমাকে ওয়াদা করতে হবে।

আসমা খাতুন রাগের ভান করে গম্ভীরস্বরে বললেন, তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস?

তানভীর মায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলল, সে জন্য মাফ চাইছি।

আসমা খাতুন ছেলের মাথায় চুমো খেয়ে ভিজে গলায় বললেন, তুই আমার একমাত্রা আঁতড়ীছেড়া ধন, ওয়াদা করতে বলছিস কেন? তোর সুখের জন্য শরীয়তের নিষেধ ছাড়া সবকিছু করতে পারব। হল তো? এবার বল।

তানভীর ঘড়ি দেখে বলল, তুমি কি বলতো মা, প্রায় গেড় ঘন্টা হয়ে গেল অঞ্জু এসেছে, তাকে খাওয়ার কথা বলনি। ভাগ্যিস ধুবচাচিয়া পৌঁছে হোটেলে খেয়েছিস। এখন আসরের নামাযের সময় হয়ে এল। নাস্তা পানিও খাওয়াবে না?

ভুল বুঝতে পেরে আসমা খাতুন লজ্জা পেলেন। তা প্রকাশ না করে হাসি মুখে বললেন, অঞ্জু মাকে দেখে সে কথা মনেই হয় নি। এমন সময় আজান হচ্ছে শুনে আবার বললেন, রাতে তোর কথা শুনব। এখন মসজিদ থেকে নামায পড়ে আয়। ততক্ষণে আমিও নামায পড়ে নাস্তার জোগাড় করি। নামায পড়ে এসে বাজারে যাবি। মা আমার শহরের বড় লোকের মেয়ে, পাতে ভালো কিছু দিতে হবে তো?

অঞ্জু লজ্জা পেয়ে বলল, শহরের বড় লোকের মেয়ে হলেও এখানে আপনার মেয়ে। যা দেবেন তাই খাব।

তানভীর বেরিয়ে যাওয়ার পর অঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নামায পড়?

জি।

পুকুর ঘাটে অযু করতে যাবে? না এখানে বদনাতে পানি দেব?

পুকুর ঘাটে যাব।

তা হলে এস বলে আসমা খাতুন অঞ্জুকে নিয়ে পুকুর ঘাটে এলেন।

ঘাটটা ঘরের পিছন দিকে অল্প একটু দূরে। ঘাটে এসে অঞ্জুর মন জুড়িয়ে গেল। বেশ বড় পুকুর। চার পাশের পাড়ে কলাগাছ ভর্তি। কয়েকটা সুপারী ও নারকেল গাছ কলা গাছের মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। নানান রঙের একপাল হাঁস পুকুরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে কতকগুলো মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ভেসে উঠছে। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আসমা খাতুন জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছ মা?

অঞ্জু বলল, আচ্ছা মা, হাঁসগুলো ডুব দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ভেসে উঠছে কেন? তুমি বোধ হয় এই প্রথম গ্রামে এলে তাই না?

জি, আপনি ঠিক বলেছেন। বলুন না, হাঁসগুলো ডুব দিয়ে অতক্ষণ কি করে?

পুকুরের পানির নিচের মাটি খুব নরম। যাকে আমরা পাঁক বলি। ঐ পাঁকে গেড়ি থাকে। হাঁসগুলো ডুব দিয়ে ঐ গেঁড়ী তুলে খাচ্ছে। ওটা ওদের খুব প্রিয় খাবার। এবার অজু করবে চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অঞ্জু এতক্ষণ ঘাটের দিকে লক্ষ্য করেনি। এবার তাকিয়ে দেখল, উপর থেকে লম্বা লম্বা কি সব গাছের গুড়ি দিয়ে সিঁড়ির মতো ধাপ করা রয়েছে।

আসমা খাতুন তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বুঝতে পেরে বললেন, গ্রামে পাকা ঘাট খুব কম থাকে। যারা ধনী তারা পাকাঘাট করে। তারপর তার একটা হাত ধরে বললেন, জুতো খুলে আস্তে আস্তে নাম।

এশার নামায পড়ে খাওয়া দাওয়ার পর আসমা খাতুন ছেলেকে বললেন, এবার বল, সেদিন অঞ্জুকে কি সব বলে রাগিয়ে দিয়েছিলি।

তানভীর বলল, সে সব শুনলে তুমি যেমন রেগে যাবে তেমনি মনে ব্যথাও পাবে।

তবু আমি শুনতে চাই। তুই বল।

ওকে যে আমি ভালবাসি তা কোনোদিন মুখ ফুটে বলি নি। তবু কেমন করে জানি জেনে যায়। চাকরি নেয়ার সময় মিথ্যে বায়োডাটা দিয়েছিলাম। সেটা ও বুঝতে পারে। তারপর দিনের পর দিন আমার পরিচয় জানার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। প্রায় বছর খানেক পর এক গভীর রাতে আমি থিসিসটা লিখছি, সেই সময় আমার রুমে আসে। তারপর টেবিলের উপর থিসিসটা পড়ে আমার আসল পরিচয় জানাতে বাধ্য করে। ততদিনে ওর আচার-আচরনে বুঝতে পারি আমাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে। আমার পরিচয় পেয়ে বিয়ের কথা বলে। তুমি যে শহরের মানুষকে অমানুষ মনে কর এবং কিছুতেই ওকে ছেলের বৌ করে ঘরে তুলবে না। সে কথা জানাই। তখন ও রেগে দিয়ে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে ও চলে যেতে বলে আমার রুম থেকে বেরিয়ে যায়। আমি জানতাম, যা কিছু বলেছে রাগের মাথায়। রাগ পড়ে গেলে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসবে। তাই চলে আসার চিন্তা করি নি।

ও বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে ওর দাদি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। দাদি মাঝে মাধ্যে এসে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করতেন। উনি

আমাকে নাতির মতো স্নেহ করতেন। আমিও ওনাকে দাদি বলতাম। আমি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করতে বললেন, "আমি তোমাদের সব কথা বাইরে থকে শুনেছি। তুমি আমার ছোট ছেলে সামসুদ্দিনের ছেলে। তারপর বাবার ইতিহাস জানিয়ে বললেন, চাচা মানে অঞ্জুর বাবা নাকি দাদাজী তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন জেনে ওনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। দাদাজী ওনাকে ও ত্যাজ্য পূত্র করার হুমকি দিয়ে বিরত রাখতে বাধ্য করেন। আর দাদি আজও বাবা ও তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসান। তারপর আমার রুম থেকে ফিরে যাওয়ার সময় অঞ্জুর উপর রাগ করে চলে যেতে নিষেধ করে যান। বাবার ও তোমার সাবধান বাণী মনে পড়তে দাদির নিষেধ সত্ত্বেও খুব ভোরে চলে আসি। কথা শেষ করে তানভীর ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, মা যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। চোখের পলক পড়ছে না। একদৃষ্টে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

তানভীর ভেবেছিল, অঞ্জুর পরিচয় জেনে মা খুব রেগে গিয়ে তাকে রাগারাগি করবে। আর তা না হলে মনে খুব ব্যথা পেয়ে চোখের পানি ফেলবে। কোনোটাই করল না দেখে ও তাকে ঐ অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকতে দেখে তানভীর ভয় পেয়ে মা বলে জড়িয়ে ধরল। পরক্ষণে ঢলে পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভালো করে ধরে মা, মাগো বলে ডেকে নাড়া দিতে দিতে বলল, তোমার কি হয়েছে মা? কথা বলছ না কেন?

অঞ্জুও খুব ভয় পেল। ভাবল, সবকিছু শুনে উনি হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছেন। বলল, তানভীর তুমি ডাক্তার নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ মায়ের মাথায় পানি ঢালি।

তানভীর মাকে শুইয়ে দিয়ে বলল, তুমি ঠিক বলেছ, আমি ছোট নানিকে খবরটা দিয়ে ডাক্তার আনতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গেল।

তানভীরের নানা-নানি মারা গেছেন। নানার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সাইদা খাতুন খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এলেন। এসে অঞ্জুকে আসমা খাতুনের মাথায় পানি দিতে দেখে বললেন, তুমিই তা হলে ঢাকা থেকে এসেছ? তোমার কথা তানভীরের ছোট নানার মুখে শুনেছি। তারপর তাকে সরে যেতে বলে আসমা খাতুনের চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত হলেন। নাকে গাল ঠেকিয়ে বুঝতে পারলেন নিঃশ্বাস বন্ধ। তাড়াতাড়ি বুকের কাপড় সরিয়ে কান ঠেকিয়ে কেঁদে উঠে অঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কার মাথায় পানি ঢালছিলে, ওতো মারা গেছে। তারপর আলনা থেকে একটা বিছানার চাদর নিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে স্বামীকে ডেকে আনার জন্য কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।

তানভীরের ছোট নানির কথা শুনে অঞ্জু নিজেকে অপরাধী ভেবে আসমা খাতুনের লাশের দিকে তাকিয়ে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। তখন তার চোখ থেকে অবিরল ধারায় পানি পড়তে লাগল।

* * *